আপন ঘর বাঁচান

মূল

জাস্টিস মাওলানা মুহাম্মাদ তাক্বী উছমানী

অনুবাদ

মুহাম্মাদ হাবীবুর রাহমান খান

উস্তায, জামিয়া ইসলামিয়া, তাঁতীবাজার, ঢাকা

খতীব, কোতোয়ালী রোড জামে মসজিদ, ঢাকা

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, মাসিক জাগো মুজাহিদ

মাকতাবাতুল আশ্‌রাফ

(ধর্মীয় পুস্তকের অভিজাত প্রকাশক)

৩/৬, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০,বাংলাদেশ

ফোনঃ ২৩৪৮৭৭

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাক্বী উছমানী সাহেবের

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ তাক্বী উছমানী ইবনে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহঃ), মুফতী আযম, পকিস্তান ও প্রতিষ্ঠাতা, জামিয়া দারুল উলূম করাচী।

জন্ম ঃ ৫ শাওয়াল ১৩৬২ হিজরী, মোতাবেক অক্টোবর ১৯৪৩ ঈসায়ী।

শিক্ষা ঃ (ক) দাওরা-ই হাদীছ, দারুল উলূম করাচী থেকে ১৩৭৯ হিঃ মোতাবেক ১৯৬০ ঈসায়ী।

(খ) ফাযেলে আরবী, ১৯৫৮ সালে পাঞ্জাব বোর্ড থেকে মেধা তালিকার শীর্ষে।

(গ) বি, এ, করাচী ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৬৪ ঈসায়ী।

(ঘ) এল, এল, বি, করাচী ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৬৭ ঈসায়ী মেধা তালিকার শীর্ষে।

(ঙ) এম, এ আরবী, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি হতে ১৯৭০সনে মেধা তালিকার শীর্ষে।

শিক্ষকতা ঃ হাদীছ শরীফ ও ফিকাহ সহ অন্যান্য ইসলামী উলূম শিক্ষাদান ১৯৬০ ঈসায়ী থেকে অদ্যাবধি, দারুল উলূম করাচী।

সাংবাদিকতা ঃ মাসিক আল বালাগ (উর্দূ) সম্পাদনা ১৯৬৭ থেকে অদ্যাবধি।

মাসিক আল বালাগ (ইংরেজী) সম্পাদনা ১৯৮৯ থেকে অদ্যাবধি।

নিয়মিত কলামিষ্ট, দৈনিক জঙ্গ (করাচী)

পদ ও দায়িত্ব ঃ ভাইস প্রিন্সিপাল, দারুল উলূম করাচী ১৯৭৬ থেকে। তত্ত্বাবধায়ক, রচনা ও প্রকাশনা বিভাগ, দারুল উলূম করাচী। বিচারপতি, শর'য়ী আদালত, পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট। ভাইস প্রেসিডেন্ট, আন্তর্জাতিক ফিকাহ্ একাডেমী জিদ্দা সৌদী আরব। বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকে শর'য়ী তত্ত্বাবধায়ক বোর্ডের সদস্য।

সিন্ডিকেট সদস্য, করাচী ইউনিভার্সিটি।

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين ـ اما بعد

আপন ঘর বাঁচান

যুগের পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটছে যে, পূর্বকালে যে পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হত, এখন তা সামান্য সময়েই সংগঠিত হয়। আজকের অবস্থার সাথে বেশি দিন নয় মাত্র পনের-বিশ বৎসর পূর্বের অবস্থাকে তুলনা করলে, এটাই প্রতিয়মান হবে যে, জীবনের প্রতিটি স্তরে পরিবর্তন এসেছে। মানুষের চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি -বিবেচনা, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, বসবাসের পদ্ধতি, পারস্পারিক সম্পর্ক, মোটকথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যে, কোন কোন সময় একথা ভাবলে হতবাক হতে হয়। আফছোছ! যদি পরিবর্তনের এ প্রবল গতি সঠিক খাতে প্রবাহিত হতো! তাহলে, আমাদের দিন ফিরে যেত। কিন্তু হায়! আফছোছ! অত্যন্ত হতাশা ও পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, এ সকল প্রচেষ্টা ও প্রবল গতি উল্টো দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে। কোন এক কবি নিম্নোক্ত পংক্তিটি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে লক্ষ্য করে বললেও আজ তা আমাদের অবস্থার প্রতিই পূর্ণভাবে ফিট হচ্ছ।

"দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে, কিন্ত গন্তব্য স্থলের দিকে নয়"

এ কথাকে কতদিন আর কতভাবে বলা যাবে যে, পাকিস্তান ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জন্ম নিয়েছিলো। যাতে এ এলাকার মুসলমানগণ নিজ জীবনে খোদার বিধান বাস্তবায়িত করে সমগ্র দুনিয়ার জন্য অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপনে সমর্থ হয়। কিন্তু আমাদের সকল প্রচেষ্টা এর বিপরীত দিকেই ব্যয় হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে।

যে বাড়ি থেকে পূর্বে কোন কোন সময় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের আওয়ায শোনা যেত, আজ সেখানে শুধু সিনেমার অশ্লীল গানের আওয়াযই কানে আসে। যে সকল জায়গা সর্বদা আল্লাহ্, রাসূল, সাহাবায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের আলোচনায় মুখর থাকতো, আজ সেখানে বাপ-বেটার মাঝে টি, ভি, ফিল্ম ইত্যাদির আলোচনাই সর্বক্ষণ হতে থাকে। যে সকল পরিবারে কোন অপরিচিত নারী বা নারীর ছবি প্রবেশ অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার ছিলো, আজ সেখানে বাপ-বেটা, ভাই-বোন একত্রে বসে অর্ধনগ্ন নর্তকীদের নাচ দেখতে ব্যস্ত থাকে এবং এতে বন্য আনন্দও লাভ করে থাকে। যে সকল বংশের লোকেরা হারাম উপার্জনকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় মনে করে তা থেকে সযত্নে বেঁচে থাকতো, আজ সে সকল খান্দানের লোকেরা সূদ, ঘুষ, ও জুয়ার আমদানী দিয়ে নির্বিঘ্নে উদর পূর্তি করছে। পূর্বে যে সকল মহিলা বোরকা পরিহিত অবস্থায়ও বাড়ির বাইরে বের হতে ইতস্তঃবোধ করতো, তারা আজ ওড়না ব্যবহার করা থেকেও নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছে। মোটকথা! ইসলামী আহ্কামকে আমলী জীবন থেকে এত দ্রুত প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে যে, ভবিষ্যতের চিন্তা করতে গেলে অনেক সময় অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে।

এই ভয়ানক পরিস্থিতির পিছনে যদিও অনেক কারণ আছে, তা সত্ত্বেও আমি এখন শুধুমাত্র একটি কারণ নিয়ে আলোচনা করবো। আল্লাহ পাক যেন নিজ দয়ার এর গুরুত্ব অনুধাবন করার এবং এজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের তৌফিক দান করেন। আর সে কারণটি হলো, আমাদের সমাজে যাদেরকে দ্বীনদার মনে করা হয়, তারা নিজ পরিবারবর্গের দ্বীনী তারবিয়্যাত ও ইসলাহ সম্পর্কে একান্তই বে-ফিকির হয়ে বসে আছে। আপনি যদি আপনার আশ-পাশে দৃষ্টি ফেরান, তাহলে, একথার অনেক প্রমাণই আপনি দেখতে পাবেন যে, অনেক বাড়ির কর্তা ব্যক্তিগতভাবে খুবই দ্বীনদার, তথা নামায-রোযার পাবন্দ, সূদ-ঘুস ও জুয়া ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকেন, মোটামোটি দ্বীনী ইল্মও রাখেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে জানতে খুবই আগ্রহ রাখেন। কিন্তু তার পরিবারভুক্ত অন্যান্য লোকজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দূরবীন দিয়েও কোন ভাল গুণ দৃষ্টিগোচর হয় না। খোদা-রাসূল,

দ্বীন-ধর্ম, কি্বয়ামত ও আখিরাত ইত্যাদি মৌলিক বিষয়াবলীও তাদের চিন্তা ভাবনার একান্তই বহির্ভূত হয়ে পড়েছে। হ্যাঁ তাদের বড় থেকে বড় অনুগ্রহ এটাই যে তারা মা-বাপের ধর্মীয় কার্যকলাপ সহ্য করে নেয় এবং তা ঘৃণা করে না, কিন্তু এর চেয়ে বেশি তারা কিছু চিন্তাও করে না এবং করতে আগ্রহীও নয়।

অবশ্য এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলের জন্য দায়ী হবে এবং সন্তানের পরিপূর্ণ হিদায়েত মা-বাপের আয়ত্বেও নয়। নূহ আলাইহিস্ সালামের ঘরেও কেন'আনের মত সন্তান জন্ম নেয়। কিন্তু এ দায়িত্বতো প্রতিটি মুসলমানের উপরই অর্পিত হয় যে, সে নিজ পরিবারের লোকদের দ্বীনী তারবিয়্যাতের জন্য নিজের সাধ্যমত সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করবে। যদি চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা সঠিক পথে না আসে, তাহলে, অবশ্য সে তার দায়িত্ব মুক্ত হবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এদিকে ভ্রুক্ষেপও না করে, ব্যক্তিগত আমলের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন এবং পরিবারস্থ লোকদের ধর্মীয় ব্যাপারে লক্ষ্যও না করেন, তাহলে, তিনি কিছুতেই আল্লাহ্ পাকের আদালতে নিস্কৃতি পাবেন না। এর উপমা ঐ নির্বোধের ন্যায় যে নিজ সন্তানকে আত্মহত্যা করতে দেখে একথা বলে পাশ কেটে যায় যে, জোয়ান বেটা! সে নিজেই নিজ কর্মের জন্য দায়ী।

কেন'আন নিঃসন্দেহে হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামের পুত্র ছিলো এবং মৃত্যু পর্যন্তও তার ইসলাহ (সংশোধন) হয়নি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তার মহান পিতা তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য কত ধরনের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। তিনি কী কী ভাবে কেন'আনের বাড়াবাড়ী সহ্য করে, তাকে দাওয়াত দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও সে নিজের জন্য হিদায়াতের নৌকার পরিবর্তে কুফরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গকেই মনোনীত করে নিলো। অবশ্য নূহ আলাইহিস্ সালাম তাঁর দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দায়মুক্ত হয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আজকে আমাদের সমাজে এমন কোন ব্যক্তি আছে কি? যিনি নিজ পরিবারস্থ লোকদের বিশেষ করে নিজ সন্তানের ইসলাহ (সংশোধন) ও দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষার জন্য এরূপ চিন্তা ও চেষ্টা ব্যয় করছেন?

পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী, একজন মুসলমানের উপর শুধুমাত্র তার নিজের আমল, আখলাক সংশোধনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি, বরং নিজের ইসলাহের সাথে সাথে নিজ পরিবারবর্গ, নিজ সন্তান-সন্ততি, নিজ আত্মীয়-স্বজন ও নিজ গোত্রের লোকদের ইসলাহের (সংশোধনের) প্রচেষ্টায় সর্ব প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্বও তাকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে আর কে বেশি যত্নশীল হতে পারে? এতদ্‌সত্ত্বেও নবুয়ত প্রাপ্তির পর তাঁর উপর সর্ব প্রথম যে হুকুম নাজিল হয়েছিলো তা ছিলো এই যে, وانذر عشيرتك الاقربين অর্থ, এবং আপনি নিজ গোত্রের নিকটাত্মীয়দেরকে আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় প্রদর্শন করুন।

যার ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের এ হুকুমের উপর আমল করার জন্য নিজ গোত্রের নিকটাত্মীয়দেরকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে একত্রিত করলেন এবং খানা খাওয়া শেষে বললেন,

يافاطمة بنت محمد ياصفية ابنة عبد المطلب، يابنى عبد المطلب لا املك لكم من الله شيئا، سلونى ماشئتم بنى عبد المطلب انى والله ما اعلم شابا من العرب، جاء قومه بافضل مما جئتكم به ؟ انى قد جئتكم بخير الدنيا والاخرة وقد امرنى الله ان ادعوكم اليه فايكم يئوازرنى على هذا الامر على ان يكون اخى -

অর্থ, হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ! হে সুফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব! হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানেরা! আমার আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে তোমাদের (মুক্তি) সম্পর্কে কোন এখতিয়ার (ক্ষমতা) নেই। তোমরা (আমার মাল হতে) যতটুকু ইচ্ছা আমার নিকট চেয়ে নাও। হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানেরা! আল্লাহ্‌র কসম! যে জিনিষ আমি তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছি, আমার আরবের এমন কোন যুবক সম্পর্কে জানা নেই। যে, নিজ গোত্রের লোকদের জন্য এর চেয়ে উত্তম

কোন জিনিষ নিয়ে এসেছে। আমি তোমাদের নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিয়ে এসেছি এবং আল্লাহ্ পাক আমাকে হুকুম দিয়েছেন যে, আমি যেন তোমাদেরকে তাঁর দিকে আহবান করি। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে? যে এ কাজে আমার হাতকে মযবুত করবে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আমার ভাই রূপে গণ্য হবে। (তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩ ঃ ৩৫০-৩৫১ পৃঃ মিসর, ১৩৫৬ হিজরী)

কেবলমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই নয়, বরং সকল নবীর তরীকাই এই ছিলো যে তাঁরা তাদের পরিবার থেকেই তাবলীগের কাজ আরম্ভ করেছেন এবং নিজে আল্লাহ্ পাকের বিধানের উপর আমল করার সাথে সাথে নিজ পরিবারস্থ লোকদের দ্বীনী শিক্ষা দীক্ষার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় সন্তানদেরকে একত্রিত করে যে, অসীয়ত করেছিলেন, পবিত্র কুরআনে তার আলোচনা এভাবে করা হয়েছে।

اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد الهك واله ابائك

ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون

অর্থ ঃ যখন (ইয়াকুব) স্বীয় সন্তানদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার (মৃত্যুর) পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা বললো, আমরা ঐ পবিত্র সত্ত্বার ইবাদত করবো, যার ইবাদত আপনি এবং আপনার বাপ-দাদা ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক করেছেন। অর্থাৎ সেই মা'বুদের যিনি একক এবং অদ্বিতীয় এবং তাঁর আনুগত্যের উপর আমরা কায়িম থাকবো। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের দু'আ এভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

رب اجعلنى مقيم الصلوة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء

অর্থ ঃ হে আমার প্রতি পালক! আমাকেও নামাযী বানান এবং আমার সন্তানদেরকেও । হে আমার প্রতিপালক! আমার দু'আ কবুল করুন।

আম্বীয়া আলাইহিমুস্সালামের এমন এক দু'টি নয়, অনেক দু'আই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে। যার দ্বারা বুঝা যায় যে, নিজ সন্তান এবং নিজ পরিবারের লোকদের দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষার ফিকির তাদের শিরায় শিরায় ভরা ছিলো।

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনের যেখানেই মুসলমানদেরকে নিজেকে খোদায়ী আযাব থেকে বাঁচতে বলেছেন, সেখানেই নিজ পরিবারবর্গকেও খোদায়ী আযাব থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে।

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! নিজের জান ও নিজের পরিবারবর্গকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে বাঁচাও।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– وامر اهلك بالصلوة واصطبر عليها

অর্থ, নিজের পরিবারবর্গকে নামাযের হুকুম দাও এবং নিজেও এর পাবন্দী করো।

পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফের এ সুস্পষ্ট হুকুমসমূহ এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের এ সুন্নাতে জারিয়্যাহ (অব্যাহত নিয়ম) এ কথা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, একজন মুসলমানের দায়িত্ব শুধুমাত্র নিজের দ্বীনী ইসলাহ্ই নয়, বরং নিজের সন্তান ও পরিবারের দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষা দানও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া নিজ সন্তান ও পরিবারের দ্বীনী ইসলাহ (সংশোধন) ব্যতীত নিজেও দ্বীনের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করা ও টিকে থাকা সম্ভব নয়। যদি কোন ব্যক্তির পরিবারের সকল সদস্যই দ্বীন (ধর্ম) বিমুখ এবং খোদা হারা হয়, তাহলে, চাই সে ব্যক্তি নিজে যত বড় দ্বীনদারই হোক না কেন! সে একদিন না একদিন এ বে-দ্বীনী পরিবেশের প্রভাবে প্রভাবিত হবেই। কাজেই নিজেকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর দৃঢ়পদ রাখার জন্য হলেও একথা অত্যন্ত জরুরী যে, নিজের পরিবার পরিজন ও আশে

পাশের লোকদেরকেও নিজের আদর্শের (ধর্মের) অনুসারী ও সহযোগী বানানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

আমাদের বর্তমান বিপর্যয়ের এও একটি অন্যতম কারণ যে, আমরা আমাদের উক্ত দায়িত্ব সম্পর্কে একান্তই উদাসীন। বড় বড় দ্বীনদার পরিবারেও আজ নতুন প্রজন্মকে দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষা দান চিন্তার বহির্ভূত বিষয়রূপে বিবেচিত হচ্ছে। সাথে সাথে প্রাচীনপন্থি (?) (ধর্মভীরু) লোকেরাও অবস্থার সামনে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজ সন্তান ও পরিবারস্থ লোকদেরকে তথাকথিত প্রগতির স্রোতে ভেসে যেতে দেখে চুপচাপ বসে আছেন। কেউ কেউ এমন কথাও বলে থাকেন যে, আমিতো আমার পরিবারবর্গকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করার এবং দ্বীনী পরিবেশে গড়ে তোলার সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছি। কিন্তু যুগের হাওয়াই এমন যে, আমাদের ওয়ায-নসীহতের কোন 'আছর' তাদের উপর হচ্ছে না। কিন্তু উপরোক্ত বক্তব্য আমাদের কারো কারো ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা বৈ কিছুই নয়। কারণ আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার যে, আমরা কতটুকু আন্তরিকতা, কতটুকু ব্যাকুলতাও কতটুকু সহমর্মিতা ও দরদ নিয়ে এ প্রচেষ্টা চালিয়েছি। মনে করুন যদি আপনার সন্তান শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পরে, অথবা (আল্লাহ্ না করুন) তার কোন অঙ্গ আগুনে পুড়তে শুরু করে, সে সময় আপনি নিজের মনে কতটুকু ব্যাকুলতা অনুভব করেন। আর এ ব্যাকুলতার ফলে আপনি কত কঠিন কাজ কত সহজে করে ফেলেন। এখন প্রশ্ন হলো নিজের সন্তান-সন্ততিকে পাপ কাজে লিপ্ত দেখে, কখনো কি আপনার মনে এ ধরনের অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা অনুভূত হয়েছে? যদি নিজ সন্তান ও পরিবারস্থ লোকদের দ্বীনী ও চারিত্রিক অধঃপতন দেখে সত্যি-সত্যিই আপনার হৃদয়ে এরূপ অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা অনুভূত হয়, যেরূপ অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা তাকে শারীরিকভাবে অসুস্থ দেখে হয়ে থাকে এবং তাদেরকে দ্বীনী ও চারিত্রিক অধঃপতন থেকে বাঁচানোর জন্য ঐরূপই প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন, যেরূপভাবে শারীরিক ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য করে

থাকেন, তাহলে, নিঃসন্দেহে আপনি আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। কিন্তু যদি আপনি আপনার পরিবারবর্গের দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে এরূপ যত্ন, এরূপ আগ্রহ ও এ ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে না থাকেন, তাহলে, কোনরূপেই আপনি দায়িত্ব মুক্ত হতে পারবেন না। কারণ দুনিয়ার এ সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যখন আপনার সন্তানের দিকে ধেয়ে আসতে দেখেন, তখন বিপদ আশংকায় আপনার অন্তরাত্মা কিভাবে কেঁপে উঠে! অথচ দোযখের ভয়াবহ অগ্নিকে (যা থেকে বাঁচার কোন ব্যবস্থা নেই) আপনার আদরের সন্তানের দিকে হা করে তেড়ে আসতে দেখেও আপনার পিতৃস্নেহ আপনার হৃদয়কে দোলা দেয় না, এর কারণ কি? যদি আপনি আপনার শিশু সন্তানের হাতে গুলিভরা পিস্তল দেখেন, তাহলে, তার কান্নাকাটি ও আব্দারের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার হাত হতে ঐ পিস্তল ছিনিয়ে নিতে না পারেন, ততক্ষণ আপনার হুশ থাকে না। কিন্তু এর কি কারণ যে, সে সন্তানকেই যখন দ্বীনী অধঃপতন ও ধর্মীয় দেউলিয়াত্বের চরম সীমায় দেখেন, তখন শুধুমাত্র কয়েকবার মৌখিক ওয়ায নসীহত করেই নিজেকে দায়িত্ব মুক্ত মনে করেন!

এখন প্রশ্ন হলো, আপনি কি কখনো নিজ পরিবারের ইসলাহের (সংশোধনের) ব্যাপারে যত্ন সহকারে গভীরভাবে কোন কার্যকর পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করে দেখেছেন? যেরূপ আন্তরিকতা ও আগ্রহ নিয়ে আপনি আপনার সন্তান ও পরিবার-পরিজনের ভরন-পোষণের জন্য রোজগারের অন্বেষণ করে থাকেন, সেরূপ আন্তরিকতা নিয়ে কি কখনো তার ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার এবং ইসলাহের (সংশোধনের) পথ অন্বেষণ করেছেন? যে ধরনের আন্তরিকতা ও আকুতি নিয়ে তাদের শারীরিক সুস্থতার জন্য দু'আ করে থাকেন, এরূপ আন্তরিকতা ও আকুতি নিয়ে কখনো কি তাদের জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে সিরাতে মুসতাকীমের দু'আ করেছেন? যদি উপরোল্লেখিত কোন কাজই আপনি না করে থাকেন, তাহলে, আপনাকে কোনভাবেই পরিবার সম্পর্কে সজাগ ও দায়িত্ব মুক্ত বলা যাবে না।

এ সকল আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, আমাদের নতুন প্রজন্ম যেরূপ দ্রুতগতিতে ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও আ'মলী পদস্খলনের দিকে ছুটে চলছে, তার প্রাথমিক এবং কার্যকরী চিকিৎসা আমাদের ঘরেই হওয়া দরকার। যদি মুসলমানদের মধ্যে নিজ সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের ইসলাহের (সংশোধনের) সত্যিকার আগ্রহ, প্রকৃত আন্তরিকতা ও একাগ্রতা পয়দা হয়ে যায় তাহলে, বিশ্বাস করুন জাতির অর্ধেক নাগরিক সঠিক পথে এভাবেই ফিরে আসবে।

যদি কোন দ্বীনদার ব্যক্তি মনে করেন যে, আমার সন্তান খোদা বিমুখতার যে পথ ধরে এগিয়ে চলছে, তার জন্য ঐ পথই ঠিক, আর আমরা আমাদের চারিপাশে ধর্মের বিধি-নিষেধের যে প্রাচীর গড়ে তুলেছি, এটা নিতান্তই ভুল! তাহলে এরূপ বক ধার্মিকের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের ব্যর্থতার জন্য শোক প্রকাশ করা ব্যতীত আর কি-ই-বা করা যাবে।

কিন্তু যদি আপনি একথা বিশ্বাস করেন যে, আপনার ধর্মই সত্য ধর্ম। মরণের পর পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়া হবে। তাহলে, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নিজ সন্তান ও পরিবারের লোকদিগকে সেই বিচার দিনের জন্য প্রস্তুত করুন। যাতে করে তাদের মধ্যে নেক কাজের আগ্রহ এবং পাপ কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। তার সাথী-সঙ্গী ও পরিবেশও ঠিক রাখার চেষ্টা করুন। নিজ গৃহকে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, বুযুর্গানে দ্বীনের আলোচনায় মুখর রাখুন। দিনে অথবা রাতে একটি সময় নির্ধারণ করে নিয়ে পরিবারের সকল সদস্য একত্রে বসে কোন ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করার এবং শোনার ব্যবস্থা নিন। নিজের ব্যক্তিগত আ'মল ও আখলাককে এমন সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলুন, যাতে আপনার সন্তান-এর অনুসরণ করতে গৌরব বোধ করে। নিজ সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের জন্য আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে দু'আ করুন, যেন আল্লাহ্‌ পাক তাদেরকে সিরাতে-মুসতাকীমের উপর অবিচল থাকার তৌফিক দান করেন। এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণের পরও কিছু সংখ্যক হতভাগা সন্তান এমন থেকে যাওয়া সম্ভব যারা তাদের বদ-নসীবের

দরুন গোমরাহী ও অন্যায় পথকেই আকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করবে। তা সত্ত্বেও দৃঢ়তার সাথে একথা বলা যায় যে, সন্তান ও পরিবারের সংশোধনের জন্য যদি উপরোক্ত ব্যবস্থাবলী অবলম্বন করা হয় তাহলে, নতুন প্রজন্মের একটি বিরাট অংশ হিদায়াতের পথে এসে যাবে। কারণ আল্লাহ্ পাক মানুষের মেহনত ও প্রচেষ্টার মধ্যে বরকত নিহিত রেখেছেন। তাছাড়া দ্বীনের দা'ওয়াত ও তাবলীগের জন্য যে মেহনত করা হয়, তা কামিয়াব হওয়া সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াদা করা হয়েছে। এজন্য এমন মেহনত যা নিজ পরিবারবর্গের ইসলাহের জন্য করা হবে, তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে। একথা নিতান্তই অসম্ভব।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে নিজ নিজ পরিবারের ইসলাহের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর তৌফিক দান করুন। আমীন।
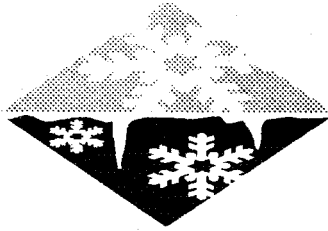
বে-দ্বীনী সয়লাব ও আমাদের করণীয়

দিনকাল বড়ই খারাপ পড়েছে। বে-দ্বীনী সয়লাব বেড়েই চলছে। দ্বীন ও ঈমানের সাথে যেন কারো কোন সম্পর্ক নেই। ধোঁকা ও প্রতারণা ব্যাপকভাবে সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এ ধরনের আলোচনা দিনরাত আমরা আমাদের মজলিসে করে ও শুনে থাকি এবং নিঃসন্দেহে এ সকল কথা সত্যও বটে। প্রতি বৎসরের তুলনা যদি তার পূর্ববর্তী বৎসরের সাথে করা হয়, তাহলে ধর্মীয় দিক থেকে দেউলিয়াপনাই দৃষ্টিগোচর হবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আমরা আমাদের মজলিসে এ সকল কথার আলোচনা এ জন্য করিনা যে, এ অবস্থার প্রতি আমরা চিন্তিত এবং আমরা এর পরিবর্তন চাই। বরং আজ এটা শুধুমাত্র মুখের কথা ও আলোচনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।

আজকাল তো এ এক ফ্যাশন হয়ে দাড়িয়েছে যে, যখন কোন সমস্যা দেখা দেয়, (বা কথা উঠে) তখন যুগ ও যুগের চাহিদার দোহাই দিয়ে, দু-চারটি বাক্য ছুড়ে দিয়ে এ মারাত্মক অবস্থার জন্য কেবলমাত্র মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এ মারাত্মক অবস্থা কিভাবে সৃষ্টি হলো? এর প্রতিকারই বা কি? এবং এর সংশোধনের জন্য আমরা কি করতে পারি? এ সকল জিনিষ আমাদের অধিকাংশের চিন্তার বিষয় হতে একান্তই বর্হিভূত। আর এ কারণেই আমরা যুগ সম্পর্কে এ ধরনের আলোচনা একান্ত বে-পরোয়াভাবে করে, শুধুমাত্র নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকি তা নয়, বরং নিজেও ঐ সকল লোকদের পিছনে চলতে শুরু করি, যাদেরকে সামান্য পূর্বে গালমন্দ করেছি। এখন প্রশ্ন হলো আপনি কি বাস্তবিকভাবেই এ মারাত্মক অবস্থার জন্য চিন্তিত? আপনি কি সত্যিই এ অবস্থার পরিবর্তন চান? যদি আপনি এ

অবস্থায় চিন্তিত না হয়ে থাকেন, এ অবস্থা পরিবর্তনের কোন ইচ্ছা যদি আপনার না থাকে, তাহলে এ ধরনের হতাশাজনক আলোচনা করে পরিবেশ দূষিত করার কি দরকার? প্রকৃতপক্ষেই যদি আপনি এ মারাত্মক অবস্থায় চিন্তিত হয়ে থাকেন এবং আন্তরিকভাবে আপনি এর প্রতিকার ও প্রতিরোধ চান, তাহলে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে দু-চার কথা বলে দেয়া কি এর জন্য যথেষ্ট হবে?

কল্পনা করুন, আমাদের চোখের সামনে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটলো এবং আমরা ভালোভাবেই জানি, যদি এর প্রতিরোধ তথা নির্বাপনের ব্যবস্থা করা না হয়, তাহলে এই অগ্নি আমাদের সকল পরিবার এবং পূর্ণ মহল্লাকে ভস্মিভূত করে দিবে। তখনও কি আমরা নিশ্চিন্তভাবে হাত পা গুটিয়ে শুধুমাত্র মৌখিক আফসোস করতে থাকবো? মাথা যদি একেবারে খারাপ না হয়ে থাকে, যদি সামান্য বুদ্ধি ও বিবেক অবশিষ্ট থাকে, তাহলেও আমরা এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ার আলোচনা এমন নিশ্চিন্তভাবে করতে পারবো না।

এমতাবস্থায় একান্ত নির্বোধ ও আহম্মক ব্যক্তিও অগ্নিকাণ্ডের গল্প অন্যকে শোনানোর পূর্বে, অগ্নি নির্বাপনের জন্য ফায়ার ব্রিগ্রেড (দমকল বাহিনীর) অফিসে ফোন করবে এবং তাদের ঘটনাস্থলে পৌছার পূর্বে সেই নির্বোধ নিজেও পানি বা অন্য কিছুর মাধ্যমে আগুন নিভানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে এবং অন্যদেরকেও এজন্য আহবান করবে। এভাবে যদি তারা আগুনকে কাবু করতে না পারে অর্থাৎ আগুন নিভাতে ব্যর্থ হয়। তাহলে আগুনের আশপাশ থেকে এমন সকল জিনিষ সরিয়ে নিতে চেষ্টা করবে, যাতে আগুন লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপরও যদি আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে তাহলে জীবন বাঁচানোর জন্য মানুষদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিবে। অন্যদেরকে যদি ওখান থেকে সরাতে না পারে, তাহলে অন্ততঃপক্ষে নিজ স্ত্রী-পুত্র তথা পরিবারকে সরিয়ে নিবে। আর যদি আগুন ছড়িয়ে পড়ার কারণে এও সম্ভব না হয়, তাহলে কমপক্ষে পালিয়ে নিজের জান তো বাঁচাবেই। কিন্তু এমনটি কোন মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয় যে,

সামনে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড দেখে শুধু মৌখিক আফসোস করে, যথারীতি নিজ কর্মে ডুবে থাকবে। অথবা এ চিন্তা করে যে, আগুন তো অনেক মানুষকে ভস্মিভূত করে ফেলেছে। আমি আর কি করবো, আগুনে ঝাপিয়ে পড়বে।

মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিই এমন যে, আগুন যতই দ্রুতগামী ও ভয়ঙ্কর হোক না কেন এবং তার যদি পূর্ণ একীনও হয়ে যায় যে, এ আগুন থেকে আমি বাঁচতে পারবো না, আমাকে আগুন ঘিরে ফেলবেই। তা সত্ত্বেও দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত সে আগুন থেকে বাঁচার জন্য দৌড়াতে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আগুন তাকে ভস্মিভূত করে দেয়।

এখন প্রশ্ন হলো, সত্যিই যদি আমাদের চারদিকে বে-দ্বীনী এবং আল্লাহ্‌র না-ফরমানীর ভয়ঙ্কর আগুন জ্বলে থাকে এবং আমরা আমাদের স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-গোত্র ও জাতির প্রতি তার ভয়াবহ তাপ অনুভব করে থাকি। তাহলে আমরা কিভাবে শুধুমাত্র ঐ মারাত্মক আগুনের আলোচনা করে ক্ষান্ত হই? বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তো আমরা ঐ ভয়াবহ আগুনে তেল ছিটানোর কাজ করে থাকি। আমরা যদি নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি। অর্থাৎ গভীরভাবে আত্ম-সমালোচনা করি তাহলে, দেখতে পাবো যে, আমরা সকল অন্যায় ও পাপের আলোচনা এমনভাবে করে থাকি যে, আমরা ঐ অন্যায় ও পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, একান্তই মাসুম। কিন্তু ঐ সমালোচনার পরে যখন আমরা আমাদের বাস্তব বা কর্মজীবনে প্রবেশ করি, তখন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা নিজেরাও ঐ সকল অন্যায় ও পাপে আকণ্ঠ ডুবে যাই, যে সকল অন্যায় ও পাপের ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আলোচনা করে মুখে ফেনা তুলেছি। আর যখন কেউ আমাদের এ ধরনের আত্মপ্রতারণার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখন আমরা এ বলে কেটে পড়ি যে সমগ্র দুনিয়া আজ বে-দ্বীনী আগুনে জ্বলছে আমরা এ থেকে কিভাবে বাঁচবো?-কিন্তু আমাদের অবস্থা কি ঐ নির্বোধ ব্যক্তির মত নয় যে, মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড দেখে তা থেকে বাঁচার পরিবর্তে তাতে ঝাপিয়ে পড়ে।

এখন প্রশ্ন হলো আমরা বে-দ্বীনীর আগুন নিভানোর বা তা থেকে লোকদিগকে বাঁচানোর জন্য সামান্য চেষ্টাও করেছি কি? অন্য লোকদের কথা বাদ দিন, কোন সময় কি আমরা আমাদের পরিবার, স্ত্রী, পুত্র, স্বীয় বংশের লোকজন এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে দ্বীনের উপর চলার জন্য এমন দরদ ও আন্তরিকতা নিয়ে বুঝিয়েছি? যেমন আন্তরিকতা ও দরদ নিয়ে আগুন থেকে রক্ষা করা হয়। আমরা কি কখনো তাদেরকে দ্বীনী ফারিযাহ্ (দায়ীত্ব) সম্পর্কে গুরুত্বের সাথে অবগত করেছি? কোন সময় কি তাদেরকে গোনাহ্‌র হাকীকাত (ভয়াবহ পরিণতি) সম্পর্কে বুঝিয়েছি? কোন সময় কি তাদের মনোযোগ পরকালের অনন্ত জীবনের অবস্থার প্রতি আকর্ষণ করেছি? তাদেরকে নেক কাজে উৎসাহিত এবং গোনাহ্‌র কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির জন্য কোন প্রকার পদক্ষেপ নিয়েছি কি? পরিবারের অন্যদের কথা না হয় বাদই দিলাম। নিজেকে বে-দ্বীনীর আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য সামান্য প্রচেষ্টাও করেছি কি? আমি ব্যক্তিগত পর্যায়েও দ্বীনী ফারিযাহ আদায় এবং গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিয়েছি কি? যদি ইসলামের সকল আহকাম মেনে চলা কষ্টকর মনে হয়, তাহলে নিজ জীবনে যৎসামান্য পরিবর্তন আনা সম্ভব ছিলো, তাও করেছি কি? শত সহস্র গোনাহ্ হতে আল্লাহ্ পাকের ভয়ে একটি গোনাহ্‌ও ত্যাগ করেছি কি? অসংখ্য দ্বীনী ফারিযাহ্ (দায়িত্ব) হতে একটির উপরও আমল শুরু করেছি কি?

যদি উপরোক্ত সকল প্রশ্নের উত্তরই 'না' সূচক হয়, তাহলে এর অর্থ হলো, আমরাই ভেতরে ভেতরে এ সর্বগ্রাসী আগুন নিভাতে চাই না এবং দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বে-দ্বীনীর অভিযোগ একটি বাহানা মাত্র। আসল ব্যাপার হলো, না দিন-কালের কোন দোষ আছে, না এ যমানার লোকদের কোন দোষ। আসল দোষ আমাদের এ জঘন্য মনোবৃত্তির, যে স্বয়ং আমরা নিজেরাই বে-দ্বীনীর রাস্তা অবলম্বন করি, অথচ তার সকল দোষ যমানার (অন্যের) ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা করি। সুতরাং যদি আমরা সত্যিকার অর্থেই বে-দ্বীনীর এ বর্তমান ভয়াবহ

অবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হই এবং প্রতিকার করতে চাই, তাহলে আমাদের কর্মপদ্ধতিও ঐরূপ হওয়া দরকার, যেরূপ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময় একজন সচেতন ও দায়িত্বশীল ভদ্রলোকের হয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব হলো যে, যুগের এ ভয়াবহ অবস্থার প্রতি কেবলমাত্র মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশের পরিবর্তে, নিজের সাধ্যমত সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো।

আল্লাহ্ পাক প্রতিটি মানুষকে তার অবস্থা অনুযায়ী একটি ক্ষমতার গণ্ডি দিয়েছেন, যে গণ্ডিতে তার কথা শোনা এবং মানা হয়। সুতরাং প্রতিটি মানুষের উচিত, যে তার ক্ষমতার গণ্ডির ভেতরে হিকমত এবং সহানুভূতির সাথে দ্বীনের তাবলীগ করা এবং যে সকল লোকেরা আল্লাহ্ পাকের না-ফরমানীর পথে চলছে, তাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ঐ পথ ত্যাগ করার উপদেশ দেয়া। এখন মানা বা না মানা তাদের ব্যাপার। অবশ্য আমাদের অভিজ্ঞতা হলো যে, যদি হিকমত ও হামদরদীর সাথে কথা বলা হয়, তাহলে তা কখনো বিফলে যায় না। কিন্তু যদি এ দায়িত্ব থেকে গাফলতী করা হয়, তাহলে আখেরাতে অবশ্যই জবাবদিহী করতে হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সত্যের দিকেই তাঁর এ মহান বাণীতে ইশারা করেছেন যে, "তোমাদের প্রতিটি ব্যক্তিই (স্বাধীন) তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

আর কিছু না হোক প্রতিটি লোকের নিজ পরিবার, স্ত্রী ও সন্তানদের উপর কিছু না কিছু কর্তৃত্ব অবশ্যই আছে। সুতরাং তার উপর ফরয যে, সে যদি তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের না-ফরমানীতে লিপ্ত দেখে, তাহলে ঐরূপ হিকমত ও মুহাব্বাত নিয়ে ঐ কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালাবে, যেরূপ আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য করে থাকে।

আল্লাহ্ পাক কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং আপন পরিবারবর্গকে দোযখের আগুন

থেকে বাঁচাও। অভিজ্ঞতার দ্বারা এ কথা বুঝে আসে যে, হক কথা যদি সঠিক ত্বরীকায় অব্যাহতভাবে বলা হয়, তাহলে তা কোন না কোন সময় অবশ্যই ফলপ্রসূ হয়। যদি আপনি নিজ পরিবারের কোন একজন লোককেও কোন একটি গোনাহ্ হতে বিরত রাখতে পারেন কিংবা কোন একটি দ্বীনী ফারিযাহ্ আদায়ে উৎসাহিত করতে সফল হন, তাহলে তা আপনার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের চরম কামিয়াবী হবে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ যদি আল্লাহ্ পাক তোমাদের মাধ্যমে কোন একজন লোককেও হিদায়াত দিয়ে দেন, তাহলে তা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়ে বড় নিয়ামত হবে। কিন্তু সকল অনিষ্টের মূল কারণ এটাই যে, আমরা স্বীয় পরিবার, স্ত্রী-পুত্র এবং স্বীয় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে প্রকাশ্যে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখেও তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চিন্তা ও চেষ্টা করার পরিবর্তে, প্রথম পদক্ষেপেই এ বলে হতাশ হয়ে যাই যে, না-ফরমানীর এ ভয়াবহ তুফানে হিদায়াতের কথা কে শুনবে? অথচ যদি একটু হিম্মত করে তাদেরকে বুঝানোর এবং সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয় এবং ফলাফলের দিকে না তাকিয়ে এ ধারা অব্যাহত রাখা হয়, তাহলে কোন না কোন সময় কিছু না কিছু আছর অবশ্যই হবে। আর হবেই না বা কেন? এটা তো কুরআনেরই ওয়াদা। "এবং নসীহত করতে থাকো, কেননা নসীহত মুমিনদেরকে (অবশ্যই) ফায়দা পৌঁছিয়ে থাকে" এবং যদি একথা মেনেও নেয়া হয় যে, সংশোধনের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং কেউই আমাদের কথা শোনবে না, তাহলেও প্রতিটি মানুষেরতো কমপক্ষে নিজের উপর নিজের অধিকার আছে এবং সত্যিকার অর্থে যদি সে প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে কমপক্ষে নিজ জীবনে তো সে আল্লাহ্ পাকের হুকুম মেনে চলতে পারে।

কিন্তু এক্ষেত্রেও আমাদের মনস্তাত্বিক বাহানা বাধা হয়ে দাঁড়ায় যে, যখন সমগ্র দুনিয়া বে-দ্বীনীর রাস্তায় দৌড়ে চলছে, তখন আমরা তাদের থেকে পৃথক হয়ে কিভাবে নিজেকে নিজে রক্ষা করবো? অথচ

প্রকৃত অবস্থা যদি এমন হতো যে, দ্বীনের উপর আমল করার জন্য আমরা আমাদের সকল উপায়, সকল শক্তি ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করে ফেলতাম এবং তা সত্ত্বেও আমাদের নিকট একথা প্রমাণিত হতো, (আল্লাহ্ না করুন) এ যুগে দ্বীনের উপর আমল করা অসম্ভব। তাহলে হয়তো আমাদের এ অভিযোগ শোনারমত হতে পারতো। কিন্তু আপনি নিজের বুকে হাত রেখে চিন্তা করুন! নিজের সকল শক্তি ব্যয় করা তো দূরের কথা, আমরা কি এ পথে সামান্য চেষ্টাও করেছি? “কাল বা যমানা খারাপ” এ অভিযোগটা যদি একটা বাহানা মাত্র না হয়, তাহলে দয়া করে একবার স্বীয় আমল ও কর্মকাণ্ড এবং স্বীয় আখলাক ও চরিত্র, পর্যবেক্ষণ করে দেখুন যে, আমরা কতগুলো কাজ আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার এবং তার আহ্কামের খিলাফ করছি। অতঃপর একটু ইনসাফ এবং বাস্তব সম্মত উপায়ে চিন্তা করে দেখুন, ঐ সকল (পাপ) কাজ থেকে কতগুলোকে সহজে পরিত্যাগ করা যায়। কতগুলো ত্যাগ করতে কিছুটা কষ্ট হবে এবং কতগুলো ত্যাগ করতে খুব বেশি কষ্ট হবে।

অতঃপর যে সকল কাজ সহজে পরিত্যাগ করা যায়, সেগুলোকে এখনই পরিত্যাগ করুন এবং যেগুলো ছাড়তে একটু কষ্ট হবে সেগুলো ধীরে ধীরে ত্যাগ করার উপায় চিন্তা করুন। আর যেগুলো ত্যাগ করা কোনরূপেই সম্ভব নয়, সেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের নিকট ইস্তিগ্ফার তো করাই যায় এবং এ দু'আও আপনি করতে পারেন, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এ গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করো। যদি এ নিয়মের উপর আমল অব্যাহত থাকে, তাহলে ধীরে ধীরে অবশ্যই মানুষের বদ আমল উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। যেমন কোন ব্যক্তি একই সাথে সুদ খাওয়া, ধোঁকা ও প্রতারণা, মিথ্যা, গীবত, বদ-নেগাহী (কু-দৃষ্টি), বদযবানী (কুকথা) এবং এ ধরনের শত গোনাহে লিপ্ত এবং সে সব গোনাহ্ এক সাথে ত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু এতো সে অবশ্যই করতে পারে যে, এ সকল গোনাহ্র মধ্য হতে

সহজে ত্যাগ করা যায় এমন একটি গোনাহ্‌কে বেছে নিয়ে তা ত্যাগ করার মনস্থ করে নেয়। আর অবশিষ্ট গোনাহের ব্যাপারে ইস্তিগ্‌ফার করার সাথে সাথে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তা থেকে নাজাত পাওয়ার দু'আ করতে থাকে। তার যদি প্রতিদিন পঞ্চাশটি জায়গায় মিথ্যা বলার অভ্যাস থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে দশ জায়গায় মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করুক। যদি প্রতিদিন পাঁচশত টাকা অবৈধভাবে কামানোর অভ্যাস থাকে, তাহলে তা হতে যতটুকু সহজে ত্যাগ করতে পারে, তা এখনই ছেড়ে দিক। সারাদিন যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই না পড়ার অভ্যাস থাকে, তাহলে যে ওয়াক্ত সবচেয়ে সহজ মনে হয়, সেই ওয়াক্ত নামায শুরু করে দিক। বাকী নামাযের জন্য দু'আ ও ইস্তিগ্‌ফার করতে থাকুক।

মোটকথা, যেরূপভাবে ভয়াবহ অগ্নি থেকে পলায়নের সময় মানুষ এদিকে লক্ষ্য করে না যে, আমি পালিয়ে কতটুকু দূরে যেতে পারবো? বরং সে উদ্‌ভ্রান্তের মত দৌড়াতেই থাকে। আর যদি আগুন তাকে পেয়েই বসে, তবুও সে চেষ্টা করে, শরীরের যতটুকু অংশ সম্ভব, বাঁচাতে। এরূপভাবে দ্বীনী ব্যাপারেও এ চিন্তা হওয়া দরকার যে, গোনাহ্ থেকে যখনই বাঁচতে পারা যায়, বেঁচে থাকা এবং নেক কাজ করার তৌফিক যখন হয়, সাথে সাথে তা করে ফেলা। যদি আমি এবং আপনি এ নিয়মে আমল করতে থাকি, একদিন না একদিন এ আগুন থেকে নাজাত ইন্‌শাআল্লাহ পাবোই। কিন্তু যদি হাত পা না হেলিয়ে শুধু আগুনকে মৌখিকভাবে গালমন্দ করতে থাকি, তাহলে এ থেকে বাঁচার আর কোন পথ নেই। আমার অভিজ্ঞতা হলো, যদি হক, কথা হক তরীকায়, অব্যাহতভাবে বলা হতে থাকে, তাহলে কোন না কোন সময় তা ফলপ্রসূ হয়ই। আপনি যদি আপনার পরিবারের কোন একজনের একটি গোনাহ্‌র অভ্যাসও ত্যাগ করাতে পারেন, কিংবা যে কোন একটি ফারিযাহ্ আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে সক্ষম হন, তাহলে তা আপনার দুনিয়া ও আখিরাত তথা উভয় জাহানের বিরাট কামিয়াবী হবে। একথা কখনও ভাববেন না যে, বদ আমলে লিপ্ত

কোটি কোটি মানুষের মধ্য হতে মাত্র একজন লোকের সংশোধনে বদ আমলের ক্ষেত্রে কতটুকু পার্থক্য দেখা দিবে? অথবা শত সহস্র গোনাহের মধ্যে একটি কমলে কি ফায়দা হবে?

আসলে লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হলো, আল্লাহ্ পাকের ইবাদত একটি নূর স্বরূপ (আলোক বর্তিকা)। আর এ নূর যত ক্ষীণই হোক না কেন, আর তার মোকাবেলায় অন্ধকার যতই প্রচণ্ড হোক না কেন, কিন্তু তা কখনও বে-ফায়দা হয় না। আপনি যদি প্রচণ্ড অন্ধকারময় স্থানে প্রথমবারেই সার্চলাইট জ্বালাতে না পারেন, তাহলে একটি ছোট কুপিতো নিশ্চয়ই জ্বালাতে পারেন। আর এটা অসম্ভব নয় যে, এ ক্ষুদ্র প্রদীপের আলোকে আপনি এই সুইচও খুঁজে পেয়ে যাবেন যার দ্বারা সার্চ লাইট জ্বালানো হয়। এর উল্টো যদি কোন আহমক সার্চ লাইট না পেয়ে হতাশ হয়ে ছোট প্রদীপও না জ্বালায়, তাহলে তার ভাগ্যে স্থায়ী অন্ধকার ছাড়া কিছুই জুটবে না।

আম্বিয়াগণ (আঃ) যখন দুনিয়ায় আসতেন প্রথম অবস্থায় তারা একাই থাকতেন এবং তাদের চারিদিকে শুধু গোমরাহীর অন্ধকার ছেয়ে থাকতো। কিন্তু ঐ অন্ধকারের মধ্যেই তারা হিদায়াতের চেরাগ জ্বালাতেন। অতঃপর এক চেরাগ হতে অন্য চেরাগ জ্বলতে থাকতো। এক পর্যায়ে ধীরে ধীরে অন্ধকার . . . দূরও হয়ে যেত এবং হিদায়াতের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তো।

অতএব, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এ হতাশার বাক্য নিজেদের মজলিসে বলা ছেড়ে দিন যে, "বে-দ্বীনী সয়লাব প্রতিরোধ যোগ্য নয়।" এর পরিবর্তে এ সয়লাবকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং এর ভয়াবহ পরিণতি হতে লোকদেরকে রক্ষা করার জন্য আপনার যতটুকু সাধ্য আছে, প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। কোন বড় ধরনের খিদমত করা সম্ভব না হলে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র যে নেক কাজটি আপনার দ্বারা করা সম্ভব তা করতে পিছপা হবেন না। অন্যান্য বড় নেক কাজের জন্য দু'আ ও প্রচেষ্টা করতে হিম্মত হারাবেন না। জাতি এবং রাষ্ট্র জনগণেরই সমষ্টির নাম। যদি প্রতিটি ব্যক্তি স্ব-স্ব স্থানে এ নিয়মে আমল শুরু

করে দেয়, তাহলে অনেক গুলো ক্ষুদ্র চেরাগ মিলে সার্চ লাইটের অভাব এভাবেও অনেকাংশে মেটাতে পারবে। তাছাড়া আল্লাহ্ পাকের নিয়মও এমন যে, যে জনগোষ্ঠির লোকেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে প্রচেষ্টা চালায়, আল্লাহ্ পাকের সাহায্য তাদের সাথে থাকে। এর ফলে আল্লাহ্ পাক তাদের সংশোধনের ব্যবস্থা করে দেন। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ- "যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো।" (আন্‌কাবুত, ২০ঃ৬৯)

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে হতাশার আযাব থেকে বেঁচে, প্রকৃত আত্মশুদ্ধির দিকে মনোযোগ দেয়ার তৌফিক দিন। যমানার বে-দ্বীনী তুফানে প্রভাবিত হওয়ার পরিবর্তে এর মোকাবেলার সাহস এবং তাওফীক দান করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

হতাশা কেন

এ প্রোপাগাণ্ডা তো দীর্ঘদিন যাবৎ করাই হচ্ছে যে, বর্তমান যুগে সামগ্রিকভাবে সর্বক্ষেত্রে ইসলামী বিধান মেনে চলা সম্ভব নয়। কিন্তু সম্প্রতি মানুষের অন্তরে এ ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে যে, ব্যক্তিগত জীবনেও দ্বীনের উপর আ'মল করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর বর্তমান পরিবেশে দ্বীনের উপর কায়িম থাকা আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মতে এটা একটা মারাত্মক ধোঁকা মাত্র। অবশ্য এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই যে আমরা এমন এক যুগে জন্ম নিয়েছি, যে যুগে চারিদিক থেকে আমাদের উপর ফিৎনার বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবন থেকে নিয়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন পর্যন্ত সর্বস্থানে ফিৎনা-ফাসাদ ছেয়ে আছে। পৃথিবীর যেখানেই মুসলমানদের বাস, সেখানেই তারা হয়তোবা অন্যদের (বিধর্মীদের) অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে, নতুবা আত্মকলহে লিপ্ত আছে। পৃথিবী জুড়ে সকল বাতিল ও অপশক্তি মুসলমানদেরকে চ্যালেঞ্জ করছে, আর মুসলমানগণ তাদের ভয়ে ভীত ও প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। এ সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান ইসলাম। ইসলাম মানুষের ব্যবহারিক (বাস্তব) জীবন থেকে অনেক পূর্বেই বিদায় নিয়েছে। মানুষের অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে বসে গেছে যে, যদি কোন ব্যক্তি ইসলামী বিধানের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করতেও চায়, তাহলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা পদে পদে তার জন্য বাধা সৃষ্টি করবে। শহর-বন্দর, হাট-বাজার, সুদ, ঘুষ, জুয়া, লটারী প্রভৃতি হারাম কারবারে ভরে গেছে। আজ মিথ্যা ও প্রতারণা কোন দোষের ব্যাপার নয়। উলংগপনা ও বেহায়াপনা এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, চোখ মেলে তাকানোর জন্য নিরাপদ আশ্রয় এবং নির্মল চিন্তার সঠিক ক্ষেত্র খুঁজে

পাওয়া খুবই দুস্কর হয়ে পড়েছে। হত্যা ও সন্ত্রাস সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথায় কথায় সামান্য কারণে একে অন্যের প্রাণনাশ করা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। হালাল উপার্জনের রাস্তা ধীরে ধীরে কমে আসছে। হারাম ও অবৈধ আমদানীকে বৈধ মনে করা হচ্ছে। সন্তান-সন্ততি দিন দিন মাতা-পিতার অবাধ্য হচ্ছে। যদিও বয়স্ক মুরুব্বী শ্রেণীর কিছু সংখ্যক লোক এখনও দ্বীনী আহ্কামের উপর আমল করতে চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু নতুন প্রজন্মের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার কোন রাস্তাই তারা খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রতি কদমে কদমে দাঙ্গা ফাসাদ ও সন্ত্রাসের এমন উৎস ছড়িয়ে আছে, যা এ যুব শ্রেণীর উত্তপ্ত খুনকে গোমরাহী ও পথ ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সকল প্রকার প্রচার মাধ্যম চিত্তবিনোদন ও সাংস্কৃতির নামে সর্বপ্রকার বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা ও চরিত্রহীনতার শিক্ষা দিয়ে, মানুষের অন্তর থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আল্লাহ্র ভয় এবং পরকালের চিন্তাকে মিটিয়ে দিচ্ছে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নাম পর্যন্ত তাদের নিকট অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে। পরবর্তিতে এরাই আগে বেড়ে দেশ ও জাতির ক্ষমতার মসনদে চেপে বসে। এ যুব সম্প্রদায় (নতুন প্রজন্ম) আজ তাদের ঐ সকল মুরুব্বীদেরকে একান্তই নির্বোধ মনে করে থাকে, যাদের চিন্তা ও কর্ম তালিকায় আল্লাহ্, রাসূল ও আখিরাত নামের কোন জিনিষ বিদ্যমান আছে। ভবিষ্যতে যখন জাতির কর্ণধার এ যুব সম্প্রদায় ব্যতিত অন্য কেউ থাকবে না, তখন তারা জাতিকে কিরূপ গোলক ধাঁধাঁ ও বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করবে, আজ তা কল্পনা করাও আমাদের জন্য মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এসব কি হচ্ছে? কেন হচ্ছে? এ অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত? গোমরাহীর ফুঁসে ওঠা সয়লাবকে কিভাবেই বা প্রতিরোধ করা যাবে? একে কে, কিভাবে প্রতিরোধ করতে পারবে?

এ সকল প্রশ্ন আজ প্রতিটি মুসলমানকে পেরেশান করে তুলছে, এখন এ দুশ্চিন্তা ধীরে ধীরে হতাশায় পরিণত হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি সত্যিকার অর্থেই নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে বসে থাকবো?

আর একথা ভেবে হাত পা হেলানোও বন্ধ করে দিবো যে, এ যুগে দ্বীনের উপর আমল করা সম্ভব নয়? আপনি যদি সামান্যও চিন্তা করেন, তাহলে এ সকল প্রশ্নের উত্তর না সূচকই মিলে থাকবে। আসল কথা হলো, আশে-পাশের অবস্থা যতই খারাপ হোক না কেন, নৈরাশ্যের কোন কারণ নেই। কারণ, আমরা যে দ্বীনের উপর ঈমান এনেছি। এ দ্বীনে নৈরাশ্যকে কেবলমাত্র কুফরীর বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্ব, তাঁর পরিপূর্ণ কুদরত (ক্ষমতা) এবং তার যাত (সত্ত্বা) ও সিফাত (গুণাবলী) এর উপর ঈমান এনেছে, তার জন্য এটা কখনও সম্ভব নয় যে, গোমরাহী ও ফাসাদের প্রচণ্ড অন্ধকার পরিবেশে সে হতাশ অথবা নিরাশ হয়ে যাবে। গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয় যে, যখন আল্লাহ্ পাক আমাদের জন্য দ্বীন ইসলামকে মনোনীত করে, আমাদের জীবন-যাপনের জন্য আমাদেরকে কিছু বিশেষ বিধান দিয়েছেন, (নাউযুবিল্লাহ) সে সময় আল্লাহ্ পাকের একথা জানা ছিলো না যে, এক যুগ এমন আসবে যে সময় পরিবেশের খারাপী ঐ সকল আহকামের উপর আমল করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। একথা তো সকল মুসলমানের নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ পাক স্বীয় বান্দাদের জন্য যে সকল বিধি-বিধান দান করেছেন, তা একথা জেনেই দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে কি কি অবস্থার সম্মুখীন হবে? আর সে অবস্থায় ঐ সকল বিধি-বিধানের উপর কেমন করে কিভাবে আমল করতে পারবে? এজন্যই একথা বলা কখনও সম্ভব নয় যে, কোন এক যুগে ঐ সকল আহকামের উপর আমল করা সম্ভব হবে না। আর আল্লাহ্ পাকের মনোনীত এ দ্বীন (নাউযুবিল্লাহ) আমলের অযোগ্য থেকে যাবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অজ্ঞতা ও গোমরাহীর যে গভীর ঘনান্ধকারে প্রেরিত হয়েছিলেন, তা কোন মানুষের অজানা নয়। সে যুগে দ্বীনের উপর আমল করা বর্তমান যুগের চেয়ে হাজার গুণ বেশি কষ্টকর ছিলো। আজ যদি আমরা নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদাত করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে বাধা দিয়ে এ

ইবাদাত থেকে বিরত রাখার মত কোন ব্যক্তি ভূ-পৃষ্ঠে নেই, কিন্তু সে যুগে আল্লাহ্ পাকের নাম নেয়াটাও ছিলো চরম অন্যায়। আজ যখন আমরা আল্লাহ্ পাকের উদ্দেশ্যে সিজদা করে তার ইবাদাত করি, তখন কারো এ দুঃসাহস হবে না যে আমাদের এ আমলে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সে যুগে আল্লাহ্ পাকের সর্বাধিক প্রিয়নবী যখন আল্লাহ্র ঘরে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হতেন, তখন তাঁর পিঠে নাপাকির (ময়লার) বোঝা রেখে দেয়া হতো। আর শুধুমাত্র পাথরের তৈরি খোদাকে (মূর্তিকে) অস্বীকার করার কারণে সমগ্র দুনিয়া তাঁর প্রাণের শত্রু এবং তাঁর রক্তের পিপাসু হয়ে যেত এবং তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কট করে তাঁর উপর জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণের সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে, তাঁর জীবনকে হুমকীর সম্মুখীন করে দেয়া হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কিরাম সে যুগেও দ্বীনের প্রতিটি আহ্কামের উপর এমনভাবে আমল করে দেখিয়েছেন যে, সমগ্র দুনিয়াবাসী মিলেও তাদের কিছু ক্ষতি (পরিবর্তন) করতে পারেনি। আজ দুনিয়ার অবস্থা যতই খারাপ হোক না কেন, ইসলামের উপর আমল করার অসুবিধা (কষ্ট) সে যুগের তুলনায় হাজার অংশের এক অংশও নেই, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর প্রিয় সাহাবাদের যুগে খোদায়ী দ্বীনের পূজারীদের উপর নেমে আসতো। ইসলামী বিধান যখন সে মারাত্মক যুগে আমলের যোগ্য ছিলো, তাহলে আজ কেন তা আমলের যোগ্য হবে না?

প্রকৃত অবস্থা হলো যে, আজ আমাদের অন্তরে সংশয় ও নৈরাশ্যের যে ওয়াস ওয়াসা (প্ররোচনা) সৃষ্টি হয়েছে তার আসল কারণ এ নয় যে, প্রকৃতপক্ষেই আজকের দুনিয়ায় ইসলাম আমলের অযোগ্য হয়ে গেছে, অথবা বর্তমান যুগে ইসলামের অনুসরণ অতীতের সকল যুগের চেয়ে অধিকতর কঠিন হয়ে পড়েছে। তার বাস্তবিক এবং আসল কারণ হলো যে, আমরা নিজেরাই সত্যিকার অর্থে, আন্তরিকভাবে,

খালিস নিয়তে দ্বীন ইসলামের উপর আমল করতে ইচ্ছুক নই। দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ফাসাদ ও পরিবেশ খারাপীর অজুহাত একান্ত অমূলক নয়। কিন্তু ইসলাম এ সকল অবস্থার জন্যও বিশেষ হিদায়াত দান করেছে। আমরা সে সকল হিদায়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করার পরিবর্তে পরিবেশ দূষণের জুজু (ভয়) মাথায় চাপিয়ে বসে গেছি, এ থেকে আগে বেড়ে হাত-পা নাড়তেও প্রস্তুত নই। অথচ আমরা যদি সৎ সাহস ও হিম্মতের সাথে সামান্য কয়েক কদম অগ্রসর হতাম, তাহলে মান্‌যিলে মাকসুদ পর্যন্ত পৌঁছানোর দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ পাক নিয়ে নিতেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে যদি বৃক্ষসারী বিদ্যমান হয়, তাহলে উপরে তাকালে রাস্তা বন্ধ দেখা যায়, যে ব্যক্তি ঐ রাস্তাকে বন্ধ মনে করে বসে থাকবে, তার ভাগ্যে কখনও মান্‌যিলে মাকসুদের আরাম নসীব হবে না। মান্‌যিলে মাকসুদে তো ঐ ব্যক্তিই পৌঁছতে পারবেন, যে সাহসে মশাল জ্বেলে পথ চলতে শুরু করে দেয়, অতঃপর কিছুদূর অগ্রসর হলেই তার বুঝে আসে প্রকৃতপক্ষে এ রাস্তা বন্ধ ছিলো না, বরং আমাদের দুর্বল ও সীমিত দৃষ্টিই আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছিল।

আজ আমরা পরিবেশ বিপর্যয়ে যে মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি, এ অবস্থায় ইসলামের সর্বপ্রথম হিদায়াত হলো, "আল্লাহ্ পাকের সাথে সম্পর্ক মজবুত করা", আজ আমাদের পেরেশানী ও অশান্তির মূল কারণ হলো, আমরা আমাদের নফ্‌স্ (প্রবৃত্তি) এবং বস্তুর (সম্পদের) গোলামে পরিণত হয়েছি। আমাদের দৃষ্টি সর্বদা জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারে এবং নফ্‌সের খাহেশ মিটানোর প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আল্লাহ্ পাকের যাত এবং সিফাতের উপর যে আস্থা ও ইয়াকীন এবং তার পরিপূর্ণ কুদরতের যে ধারণা সর্বদা একজন মুমিনের অন্তরে জাগ্রত থাকা দরকার, যা একজন মুসলমানের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। তা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু সেই হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ার জন্য আজকের চেয়ে আর উত্তম সুযোগ কখনও পাওয়া যাবে না। কারণ বিংশ শতাব্দী, আল্লাহ্ পাককে অসন্তুষ্ট করে, বস্তুবাদী সভ্যতার

ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দেয়ার ভয়াবহ পরিণতি একেবারে উম্মুক্ত করে দিয়েছে। যে সকল লোকেরা জাগতিক স্বার্থ এবং নফসের খাহেশ মিটানোকেই নিজেদের সব কিছু মনে করে; তাদের ভেতরের (ব্যক্তিগত ও পারিবারিক) খবর একটু নিয়ে দেখুন, তারা সুখ ও সম্ভোগের সকল উপকরণ করায়ত্ব করা সত্ত্বেও আন্তরিক প্রশান্তি থেকে কিরূপভাবে বঞ্চিত! সমগ্র জগতের সকল পার্থিব সম্পদ এবং চিত্তবিনোদনের সকল কিছু থাকা সত্ত্বেও তাদের আন্তরিক স্বস্তি লাভ হচ্ছে না। কারণ তারা তাদের আশেপাশে সম্পদের যে পাহাড় জমিয়ে তুলেছে, তা কখনও আন্তরিক শান্তির মহান দৌলত দিতে পারে না। বস্তুবাদী সভ্যতায় (জীবন ব্যবস্থা) এমন একটি বিশেষ পদ্ধতির জীবন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে, যার ভিত্তিই রচিত হয়েছে খোদাদ্রোহীতার উপর। এ জীবন ব্যবস্থায় বস্তু এবং সম্পদ ব্যতিত কোন কিছু দৃষ্টি গোচরই হয় না। এ সভ্যতা চাই দুনিয়ার সকল সম্পদের ভাণ্ডার এনে পদতলে জমা করুক না কেন। কিন্তু আন্তরিক প্রশান্তি ও স্বস্তি প্রদান করা এর ক্ষমতার বহির্ভূত। খোদাদ্রোহী জীবন ব্যবস্থার এটা একটা আবশ্যম্ভাবী ফল যে, এর অনুসারীরা সর্বদা এক অজানা ভয়ে আতঙ্ক গ্রস্ত থাকে, এ আতঙ্কের একটি মারাত্মক দিক এটাও যে, এর শিকার ব্যক্তি নিজেও বলতে পারে না সে আতঙ্কিত কেন? আক্রান্ত ব্যক্তি সর্বদা নিজের অন্তরে একটি অজানা আশংকা ও রহস্যজনক বেদনা অনুভব করে, কিন্তু এ শংকা ও বেদনার হেতু সে বুঝতে পারে না।

আজকের পৃথিবী যেহেতু বস্তুবাদী সভ্যতার অশান্ত ও অস্বস্তিকর জীবন বিধানের ব্যর্থতা পরিপূর্ণভাবে অনুভব করছে। এ কারণে আজ তার জন্য ইসলাম প্রদত্ত আত্মিক প্রশান্তির জীবন-বিধানের দিকে ফিরে আসা অধিকতর সহজ হয়েছে। বস্তু এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে বের হওয়ার পর যখনই কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের সাথে স্বীয় সম্পর্ক স্থাপন ও মজবুত করার চেষ্টা চালায়, প্রথম পদক্ষেপেই সে অনুভব করতে পারে যে, কোন বস্তুর অভাব তার জীবনকে (সুখ সম্ভোগের

সকল উপকরণ থাকা সত্ত্বেও) দুর্বিসহ ও অশান্তিময় করে রেখে, তিলে তিলে তাকে শুষে খাচ্ছিল। মানুষ এ জগতের স্রষ্টা ও মালিক নয় বরং সে কারো সৃষ্টি (মাখলুক)। মানব জীবনের উদ্দেশ্যই হলো "কারো ইবাদাত করা" এজন্য তার স্বভাবের চাহিদাই এমন যে, সে কোন অক্ষয় সত্তার সামনে স্বীয় মস্তক অবনত করে, তাঁর মহত্বও বড়ত্বের নিকট স্বীয় অসহায়তা ও দূর্বলতা স্বীকার করে, বিপদে আপদে তাঁর মহান নামের সাহায্য নিয়ে সাহায্যের জন্য তাকে ডাকে, জীবনের কঠিন সমস্যায় তাঁর দেয়া তাওফীকে রাহনুমায়ী (পথের দিশা) হাসিল করতে সক্ষম হয়।

আজকের বস্তুবাদী সভ্যতা মানুষকে দুনিয়ার সকল নিয়ামত জোগাড় করে দিতে পারে ঠিকই, কিন্তু তার স্বভাবে জেগে থাকা আত্মিক চাহিদা পূর্ণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। মানবের এ পবিত্র চাহিদা কোন কোন সময় প্রবৃত্তির চাহিদার বিশাল স্তূপের নিচে চাপা পড়ে যায় বটে, কিন্তু স্থায়ীভাবে তা শেষ হয়ে যায় না। আর এটাই সেই গোপন রহস্যময় স্বভাবগত চাহিদা, যা মানুষকে সুখ-সম্ভোগের সকল উপায় উপকরণ থাকা সত্ত্বেও শান্তিতে থাকতে দেয় না। কোন কোন সময় এর অভাব মানব জীবনকে উজাড় করে দেয়।

"তব বিনা জীবন চলছে এমন, পাপ সাগরে ছোট্ট তরী যেমন।"

আজ আমাদের সকল সমস্যার সবচেয়ে সফল এবং মৌলিক সমাধান (একমাত্র চিকিৎসা) হলো, আল্লাহ্ পাকের সাথে আমাদের সম্পর্ক মজবুত করা। এটা এমন সহজলভ্য সমাধান যা সকল যুগে, সকল সময়ে, কোন বাধার সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই অবলম্বন করা যায়। ইসলামের আদর্শে ইবাদাত অধ্যায়টি এজন্য রাখা হয়েছে যে, যদি এর উপর ঠিকমত আমল করা হয়, তাহলে ইবাদাতের এ পদ্ধতি আল্লাহ্ পাকের সাথে মানুষের সম্পর্ক মজবুত এবং শক্তিশালী করে তুলে। ইসলামী জীবনাদর্শে সফল জীবনের রহস্য ও যেহেতু এটাই যে আল্লাহ্ পাকের সাথে মানুষের মজবুত সম্পর্ক স্থাপিত হোক, এজন্যই ইবাদাত অধ্যায়কে সকল আহকামের উপর অগ্রগামী রাখা হয়েছে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার (আদর্শের) এক তৃতীয়াংশ এ ইবাদতের (শিক্ষা, দীক্ষা, গুরুত্ব বর্ণনা এবং এ বিষয়ে উৎসাহিত করার) জন্য ব্যয় হয়েছে।

আজ দুনিয়ার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ বটে, কিন্তু ইসলামী আহ্কামের এ অধ্যায় এমন যে, সামান্য সাহস এবং হিম্মতের সাথে ইচ্ছে করলে এর উপর আমল করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। যখন এ সকল ইবাদাতসমূহে বাস্তবিকই কোন বাধা আসে তখন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক এমন সহজ করে দেন যে, এরপর আর বাধার (বা অসুবিধার) অভিযোগ বাকী থাকে না। আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে যে সকল ইবাদাত আমাদের উপর ফরয করা হয়েছে, সেগুলো যদি ঠিকমত আদায় করা হয়, তাহলে তার আবশ্যম্ভাবী ফল এ হবে যে, আল্লাহ্ পাকের কুদরতে কামিলাহ্র (পরিপূর্ণ ক্ষমতার) উপর পূর্ণ ঈমান ও আস্থা পয়দা হবে। আর যখন কোন ব্যক্তির ঈমান ও ইয়াকিনের দৌলত নসীব হয়, তখন তার জন্য আর কোন মুশকিলই মুশকিল থাকে না এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কঠিন থেকে কঠিন বিপদেও নিরাশ হয় না। কেননা এ হাকীকত সর্বক্ষণ তার সামনে উদ্ভাসিত থাকে যে, পরিবেশ (তথা বেদ্বীনীর সকল অন্ধকার) আল্লাহ্ পাকের কবজায় (নিয়ন্ত্রণে)। আমি এ অন্ধকার দূর করতে সক্ষম না হলেও আল্লাহ্ পাক যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে এক মুহূর্তে এসব কিছুতে পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। আর এজন্যই এমন ব্যক্তির সামনে যদি বাধা আসেই, তাহলে এতে সে ক্লান্ত হয়ে বসে যাওয়ার পরিবর্তে দৃঢ়ভাবে সে বাধার মুকাবিলা করে। আর যদি অবস্থা এতই ভয়াবহ হয় যে, এর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কোন পথ তার নজরে না পড়ে, তাহলে তার সামনে এমন একটি (নিরাপদ) রাস্তা রয়েছে যা একমাত্র মুমিন ব্যতিত দুনিয়ার অন্য কোন বিপদগ্রস্থের সামনে নেই। আর তাহলো মুমিন ব্যক্তি স্বীয় সকল শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করার পর আল্লাহ্ পাকের নিকটই আত্মসমর্পণ করে তার সামনে স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করে, এ বিশ্বাস নিয়ে তাঁর দরবারে দু'আ করে যে, এ দু'আ মহান রাব্বুল

আলামীন অবশ্যই কবুল করবেন। ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য যে, বালা মুসীবত দূরীকরণ ও সকল অসুবিধা অপসারণের জন্য এর চেয়ে উত্তম ও কার্যকর রাস্তা দ্বিতীয়টি নেই। এটা একান্তই সহজ ব্যাপার যে, আমাদের সম্পর্ক (নাউযুবিল্লাহ্) এমন কোন জালিম ও অত্যাচারী সত্তার সাথে নয়, যিনি স্বীয় সৃষ্টির (মাখলুকের) সমস্যা ও বিপদ আপদ সম্পর্কে বেখবর থেকে শুধুমাত্র হুকুম জারী করতে জানেন। এটা ব্যতিত পরিবেশের (বে-দ্বীনীর) অন্ধকার দ্বারা হতাশা সৃষ্টি হওয়ার আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে? সমাজ এবং পরিবেশ তো মানুষের বাহিরের কিছু নয় বরং সমাজ ও পরিবেশ তো মানুষের আচার আচরণেই গড়ে উঠে। যদি আমাদের সমাজের প্রতিটি নাগরিক স্বীয় চরিত্র সংশোধনের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে চেষ্টা শুরু করে দেয়, তাহলে দেখতে দেখতেই সমাজের অবস্থা ও পরিবেশ একেবারে বদলে দেয়া যায়। আসুন, পরিশেষে আমরা আমাদের পূর্বসূরী বুযুর্গদের মাধ্যমে শোনা এমন একটি তাদবীর (উদ্দেশ্য অর্জনের পন্থা) পুনরায় অবলম্বন করি যা মানুষের অবস্থা (চরিত্র) সংশোধনের জন্য অন্যান্য সকল তাদবীরের চেয়ে অধিক কার্যকর। কল্পনা করুন আপনি সমাজ এবং পরিবেশের ভয়াবহ অবস্থার হাতে একান্ত অপরাগ। সমাজ এবং পরিবেশের প্রচলিত স্রোতের বিপরিত কোন কিছু করা আপনার দ্বারা সম্ভব নয়। আরাম প্রিয়তা, স্বার্থান্ধতা ও গা বাঁচানোর মনোবৃত্তি আপনার উৎসাহ উদ্দীপনা, সাহস ও হিম্মতের তলোয়ারকে একেবারে ভোঁতা . . . করে দিয়েছে। কোন ভাবেই আপনি আপনার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারছেন না। অবশ্য এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও একটি কাজ এমন আছে, যা আপনি সর্বদা সর্বাবস্থায় সকল পরিবেশে সহজেই অবলম্বন করতে পারেন। আর তাহলো আপনি আপনার চব্বিশ ঘন্টা সময় হতে সামান্য সময় পাঁচ বা দশ মিনিট বের করে, নির্জনে বসে একাগ্রতার সাথে আল্লাহ্ পাকের নিকট এ দু'আ করুন, হে আল্লাহ্ আমি আমার সমাজ ও পরিবেশের সাথে

পেরে উঠছিনা। আমার সংশোধনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আমার হিম্মত ও সাহস শেষ হয়ে গেছে। আমার মধ্যে এ পরিমাণ শক্তি নেই যে, একাই এ ভয়াবহ পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে পারি। তুমি স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা আমায় সাহায্য করো। আমার ঘুমন্ত শক্তি ও সাহস জাগিয়ে দাও, আমাকে তোমার দ্বীনী আহ্কামের উপর আমল করার শক্তি ও তাওফীক দান করো . . . .।

যদি কোন ব্যক্তি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে, খাঁটি নিয়তে, ইখলাসের সাথে, এ কাজ করতে থাকে, তাহলে অভিজ্ঞতার আলোকে একথা বলা যায় যে, এ আমলের দ্বারা বাধার সকল পাহাড় এক এক করে অপসারিত হবে (ইনশাআল্লাহ্)। অন্তরে নব উদ্দীপনা, নতুন হিম্মত ও নব জাগরণের সূচনা হবে। পরিশেষে এ ক্ষুদ্র আমলটিই একটি বিশাল দ্বীনী ইনকিলাবের ভূমিকার রূপ পরিগ্রহ করবে।

আমাদের ঈমান এমন একটি সামগ্রিক দ্বীনের উপর, যে-দ্বীনে সকল কামিয়াবীর চাবিকাঠি ঐ মহা মহিম সর্বময় ক্ষমতার আঁধার রাব্বুল আলামীনের হাতে, যার ইচ্ছা ব্যতিত দুনিয়ার একটি (বালু) কণাও এদিক থেকে ওদিকে নড়াচড়া করতে পারে না। তাহলে আমরা যারা নিজেদেরকে ঈমানদার বলে দাবী করি, তাদের জন্য সমাজ ও পরিবেশ খারাপ হওয়ার দোহাই দিয়ে নিরাশ হওয়ার কি বৈধতা থাকতে পারে? আমাদের উচিত, দূরে বসে সমাজ ও পরিবেশ নষ্ট হওয়া সম্পর্কিত সমস্যার অভিযোগ তোলার পরিবর্তে ঐ মহান সত্তার (আল্লাহ্র) দিকে ফেরা এবং তাঁর সাথে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তোলা– যার হাতে এসকল অবস্থার চাবিকাঠি। আল্লাহ্ পাক নৈরাশ্যের বিষক্রিয়া থেকে আমাদের সবাইকে হিফাযত করে, দ্বীনের সঠিক বুঝ ও দ্বীনের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন ছুম্মা আমীন

যবানের হিফাযত

তারিখ ও সময় ঃ ৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৩ ঈসায়ী
শুক্রবার বাদ আসর
স্থান ঃ বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ
গুলশান ইকবাল, করাচী, পাকিস্তান।

বয়ানের সার সংক্ষেপ

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে যে যবান দান করেছেন, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার যে, এ যবান আল্লাহ্ পাকের কত বড় নিয়ামত। কথা বলার জন্য এ যবান এমন এক অটোমেটিক মেশিন, যে জন্ম থেকে নিয়ে মউত পর্যন্ত মানুষের সঙ্গ দিচ্ছে। এতে না পেট্রোলের প্রয়োজন হয়, না সার্ভিস বা মেরামতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এ মেশিনের মালিক আমরা নই। বরং এটা খোদায়ী মেশিন, যা আমাদের নিকট আমানত রাখা হয়েছে। কাজেই এ মেশিন কেবলমাত্র তার সন্তুষ্টির কাজে ব্যবহার করতে হবে। এমন যেন না হয় যে, যা মনে এলো বলে ফেললাম। সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করতে হবে, যে কথা আল্লাহ্ পাকের হুকুম অনুযায়ী হবে, কেবল তাই বলবো। অন্য কোন কথা নয়।

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

যবানের হিফাযত সম্পর্কিত তিনটি হাদীস

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت

(صحيح البخاري. كتاب الادب)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা চুপ থাকে।" (বোখারী শরীফ)

ان العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل به في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন মানুষ যখন চিন্তা-ভাবনা ব্যতিত যবান দিয়ে কোন শব্দ বলে, তখন ঐ শব্দ সে ব্যক্তিকে দোযখের গর্তের এই পরিমাণ গভীরে ফেলে দেয় যে, পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিমের ব্যবধান যতটুকু।" (বোখারী শরীফ, যবানের হিফাযত অধ্যায়)

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

ان العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي بها بالا ، يرفعه الله بها في الجنة ، وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي بها بالا يهوي بها في جهنم

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন কোন সময় মানুষ আল্লাহ্

পাকের সন্তুষ্টির কোন কথা বলে, অর্থাৎ এমন কথা যা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির কারণ হয় এবং তা আল্লাহ্ পাকের পছন্দনীয় হয়। কিন্তু যখন সে উহা বলে, তখন তার গুরুত্ব বুঝে আসে না, অনেকটা বে-পরোয়াভাবে সে ঐ কথা বলে থাকে। অথচ আল্লাহ্ পাক ঐ কথার উসিলায় বেহেশ্তে তার দরজা বুলন্দ করেন। পক্ষান্তরে কখনও কোন মানুষ এমন কথা বলে ফেলে, যা আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ হয়, ঐ ব্যক্তি বে-পরোয়াভাবে ঐ কথা বলে ফেলে, যা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে থাকে। (বোখারী শরীফ যবানের হিফাযত অধ্যায়)

যবানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন

উপরোল্লেখিত তিনটি হাদীসেই একথার দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষেরা যেন যবানের গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এ যবানকে যেন আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির কাজে লাগানো হয় এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বিরত রাখা হয়। আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা। আর এ কারণেই যে সকল গোনাহ্ যবান দ্বারা সংগঠিত হয়, তার আলোচনা এখানে করা হচ্ছে। কেননা যবান দ্বারা সংগঠিত গোনাহ এমন যে, মানুষেরা অনেক সময় চিন্তা-ভাবনা না করে অসতর্ক অবস্থায় আলোচনা করতে গিয়ে এমন কথা বলে ফেলে, যা তাকে দোযখের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করে থাকে। এ কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দেখে-শুনে যবানকে ব্যবহার করো। যদি কোন ভাল কথা বলার থাকে, তাহলে বলে ফেল, অন্যথায় চুপ থাকো।

যবান একটি বিরাট নিয়ামত

এ যবান; যা আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে দান করেছেন; এ সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার যে, এটা আল্লাহ্ পাকের কত বড় নিয়ামত; আল্লাহ্ পাকের কত বড় পুরস্কার! যে তিনি আমাদের চাওয়া ছাড়াই কথা

বলার এমন একটি মেশিন দান করেছেন, যা মরণ পর্যন্ত আমাদেরকে সঙ্গ দিয়ে থাকে। আর এটা এমন স্বয়ংক্রিয় যে মনে সামান্য ইচ্ছে হওয়ার সাথে সাথেই যবান বলতে শুরু করে দেয়। এ মেশিনের না পেট্রোলের প্রয়োজন হয়, না ব্যাটারির, না সার্ভিসের (সংস্কারের)। যেহেতু আমরা এ মেশিন পাওয়ার জন্য কোন প্রকার পরিশ্রম বা কষ্ট করিনি, কোন অর্থও ব্যয় করিনি, এ কারণেই এ নিয়ামতের কদরও আমাদের নিকট নেই। কারণ হলো, যে কোন নিয়ামতই বসে বসে বিনা পরিশ্রমে মিলে যায়, তার যথাযথ কদর করা হয় না। এ যবানও আমরা বসে বসে বিনা মেহনতেই পেয়ে গেছি। এ যবান বরাবর কাজ করে যাচ্ছে। আমরা যা ইচ্ছা তাই যবান দ্বারা বলে থাকি। এ নিয়ামতের মূল্য ঐ সকল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন, যারা এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। যবান থাকা সত্ত্বেও যারা বাক-শক্তি হারা। বলার মত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বলতে পারে না। অন্তরে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়, কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারে না। এমন লোককে জিজ্ঞাসা করুন; সে বলে দিবে, যে যবান কত বড় নিয়ামত, আল্লাহ্ পাকের কত বড় পুরস্কার।

যদি যবান বন্ধ হয়ে যায়

চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ্ না করুন, যদি এ যবান কাজ করা ছেড়ে দেয়! বলার শত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বলা না যায়, তখন কি মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হবে। মনের ভাব মনের মাঝেই মাথা কুটে মরবে। কিছুদিন পূর্বে আমার এক আত্মীয়ের অপারেশন হয়। তিনি তার সে সময়ের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "আমার অপারেশনের পর কিছু সময় এভাবে কেটেছে যে, সারা শরীর অবশ ছিলো। তখন আমার খুব পিপাসা লেগেছিলো। আমার চারপাশে আমার প্রিয়জনেরা বসেছিলো, আমি তাদেরকে বলতে চাচ্ছিলাম, আমাকে পানি পান করাও, কিন্তু যবান ও হাত অবশ থাকায় না কথা বলতে পারছিলাম, না হাতের ইশারায় বুঝাতে পারছিলাম। এ অবস্থা

আমার প্রায় আধা ঘন্টা ছিলো।" সুস্থ হওয়ার পর তিনি বলতেন, "ঐ আধা ঘন্টা সময়, আমার জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর সময়, এমন মারাত্মক কষ্ট ও অসহায়ত্ব আমি কোন দিন অনুভব করিনি।

যবান আল্লাহ্ পাকের আমানত

মহান আল্লাহ্ পাক, যবান ও মস্তিষ্কের মাঝে এমন সূক্ষ্ম কানেকশন রেখেছেন যে, যখনই মস্তিষ্ক এ ইচ্ছা করে যে, যবান দ্বারা এ শব্দ উচ্চারণ করা হোক, ততক্ষণাৎ যবান তা উচ্চারণ করে থাকে। যদি মানুষের এ দায়িত্ব দেয়া হতো যে, তোমরা নিজেরা এ বাকযন্ত্র ব্যবহার করো! তাহলে এজন্য প্রথমে এর ইলম শিখতে হতো যে, যবানকে কিভাবে কোন দিকে ঘোরালে "আলিফ" উচ্চারণ করবে, কোন দিকে নিয়ে "বা" উচ্চারণ করতে হবে। এভাবে মানুষ একটি বিরাট মছিবতের শিকার হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ পাক জন্মগতভাবে মানুষের মাঝে এমন একটি কুদরতী শক্তি লুকায়িত রেখেছেন যে, সে যে কোন শব্দ উচ্চারণ করতে চায়, মনে মনে তার ইচ্ছে করার সাথে সাথেই যবান তার সামান্য হরকতেই তা আদায় করে দেয়। আল্লাহ্ পাকের দেয়া এ কুদরতী মেশিন ব্যবহার করার সময় আমাদের চিন্তা করা দরকার যে, আমরা এ মেশিনতো কোন অর্থ ব্যয় করে খরিদ করিনি, বরং আল্লাহ্ পাক নিজ দয়ায় আমাদেরকে দান করেছেন। কাজেই এটা আমাদের সম্পত্তি নয়, আমরা এর মালিক নই। বরং এটা আমাদের নিকট আল্লাহ্ পাকের আমানত। কাজেই এ আমানতকে তার সন্তুষ্টির কাজে ব্যবহার করা উচিত। এমনটি আমাদের জন্য কখনও সমুচিন নয় যে, ভাল-মন্দ চিন্তা না করে, যা মনে আসলো বলে চললাম। বরং চিন্তা-ভাবনা করে যা শরীয়ত সম্মত এবং আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সহায়ক, কেবলমাত্র তাই বলা উচিত। আর যা শরীয়তের পরিপন্থি-আল্লাহ্ পাকের মর্জির খেলাপ তা কখনও বলা উচিত নয়। মোট কথা এটা সরকারী মেশিন, কাজেই তার মর্জি মোতাবেক ব্যবহার করতে হবে।

যবানের সঠিক ব্যবহার

আল্লাহ্ পাক এ যবানকে এমন বানিয়েছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এ যবানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, যা সামান্য পূর্বে আপনারা একটি হাদীসের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, এক ব্যক্তি তার যবান থেকে বেপরোয়াভাবে একটি কথা বলে ফেললো, কিন্তু ঘটনাক্রমে কথাটি উত্তম হওয়ায়, আল্লাহ্ পাক ঐ ব্যক্তির মর্তবা অনেক বাড়িয়ে দেন এবং তাকে অনেক অনেক ছওয়াব দান করা হয়। যখন কোন কাফির তার অসত্য ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়, তখন সে এ যবানের বদৌলতেই মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে থাকে। কারণ কালিমায়ে শাহাদাত সে এ যবান দ্বারাই উচ্চারণ করে থাকে।

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

এ কালিমা পড়ার পূর্বে যে ব্যক্তি কাফির ছিলো, সে ব্যক্তিই এ কালিমা পড়ার পর মুসলমান হয়ে যায়। পূর্বে সে জাহান্নামী ছিলো, এখন জান্নাতী হয়ে গেল। পূর্বে আল্লাহ্ পাকের অভিশাপে অভিশপ্ত ছিল, এখন আল্লাহ্ পাকের প্রিয় পাত্র হয়ে গেল। এখন সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এ মহান বিপ্লব একটি মাত্র কালিমা দ্বারা সংগঠিত হলো, যা সে এ ক্ষুদ্র যবান দ্বারা উচ্চারণ করেছে।

যবানকে যিক্‌রের মাধ্যমে তাজা রাখুন

কোন ব্যক্তি যদি ঈমান আনয়নের পর, যবান দ্বারা একবার سُبْحَانَ اللهِ (সুবহানাল্লাহ) বলে, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, "এর দ্বারা আমল ওজন করার মানদণ্ডের অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যায়। এ শব্দটি ছোট হলেও এর ছওয়াব অনেক বড়। অন্য এক হাদীসে আছে, سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ (সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজীম।) এ দু'টি কালিমা যবানের উপর খুবই হাল্কা, অর্থাৎ খুব সহজেই উচ্চারণ করা

যায় যে, মুহূর্তের মধ্যে আদায় হয়ে যায়। কিন্তু মিযানে (আমলের মানদণ্ডে) খুবই ভারী এবং দয়াময় আল্লাহ্ পাকের নিকট খুবই প্রিয়।

মোটকথা আল্লাহ্ পাক এ মেশিন এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, যদি এর মোড় সামান্য ঘুরিয়ে দেয়া যায় এবং যথাযথভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করা হয়, তাহলে দেখবেন আপনার আমলনামায় কত নেকী বাড়িয়ে তুলছে, আপনার জন্য জান্নাতে কেমন উত্তম মহল তৈরি করছে, কিভাবে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি আপনাকে দান করে। কাজেই আল্লাহ্ পাকের যিক্র দ্বারা যবানকে তাজা রাখুন। তাহলে দেখবেন কত দ্রুত আপনার দরযা বুলন্দ হচ্ছে। এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন আ'মল উত্তম?" মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, তোমার যবান আল্লাহ্র যিক্রে ভিজা (ব্যস্ত) থাকা। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে সবর্দা আল্লাহ্ পাকের যিক্র করবে। (তিরমিযি শরীফ, যিক্রের ফযিলত অধ্যায়, হাদীস নং ৩৩৭২)

যবানের মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষা দিন

যদি আপনি এ যবান দ্বারা কাউকে দ্বীনের একটি সামান্য বিষয় শিক্ষা দান করেন, যেমন, কেউ গলদ তরীকায় নামায পড়ছিল, আপনি দেখলেন যে, সে ভুল তরীকায় নামায আদায় করছে। আপনি নির্জনে তাকে মুহাব্বত ও স্নেহের সাথে নম্রভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, ভাই তোমার নামাযের মধ্যে এ ভুল আছে, এটা এভাবে নয়, এভাবে আদায় করো। আপনার যবানের সামান্য কথায় তার নামায সংশোধন হয়ে গেল এবং সে সহীহ্ শুদ্ধভাবে নামায পড়তে লাগলো। এ সময় থেকে নিয়ে সমগ্র জীবন যত নামায সে সহীহ তরীকায় আদায় করবে, তার সবগুলোর ছওয়াব আপনার আমলনামায়ও লিখা হবে।

শান্তনার কথা বলা

কোন এক ব্যক্তি দুঃখ ও পেরেশানীতে আছে। আপনি তার পেরেশানী দূর করার জন্য তার দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার মানসে তাকে

কোন শান্ত্বনামূলক কথা বললেন, যার ফলশ্রুতিতে তার দুঃখ কিছুটা লাঘব হল, সে এতে শান্ত্বনা লাভ করল। তাহলে এ শান্ত্বনা-বাক্য বলা, আপনার জন্য বিরাট ছওয়াব ও নেকীর কারণ হবে। যেমন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এক হাদীসে ইরশাদ করেন,

مَنْ عَزّٰى ثَكْلٰى كُسِيَ بُرْدًا فِى الْجَنَّةِ ـ

অর্থাৎ ঃ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ মহিলার জন্য শান্ত্বনামূলক কথা বলে, যার বাচ্চা হারিয়ে গেছে, কিংবা মারা গেছে। তাহলে আল্লাহ্ পাক ঐ শান্ত্বনাদাতাকে বেহেশ্‌তের মধ্যে মূল্যবান জোড়া (পোশাক) পরিধান করাবেন।

মোটকথা! এ যবানকে নেক কাজে ব্যবহার করার যে সকল রাস্তা আল্লাহ্ পাক রেখেছেন, সে সকল রাস্তায় সঠিক পদ্ধতিতে এ যবানকে ব্যবহার করে দেখুন যে, আপনার আমলনামায় কিভাবে ছওয়াব জমা হতে থাকে! যেমন কোন লোক যাচ্ছে, কিন্তু তার রাস্তা জানা নেই, আপনি তাকে রাস্তা বলে দিলে। ব্যাহ্যিকভাবে যদিও আপনি একটি ক্ষুদ্র কাজ করলেন এবং আপনার কল্পনায়ও আসেনি যে, এও কোন ছওয়াবের কাজ। কিন্তু আল্লাহ্ পাক এর ফলে আপনাকে অগণিত নেকী দান করবেন।

মোটকথা যদি একজন মানুষ তার যবানকে সহীহভাবে ব্যবহার করে, তাহলে অবশ্যই তার জন্য বেহেশ্‌তের দরজা খুলে যাবে। তার গোনাহ্সমূহ মাফের ওসিলা হবে। কিন্তু (আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে রক্ষা করুন) যদি এ যবানকে অবৈধ-গলদভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এ যবানই মানুষকে দোযখে টেনে নিবে।

যবান মানুষকে দোযখে নিয়ে যাবে

এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যত মানুষ দোযখে যাবে, তাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ নিজ

যবানের গোনাহের কারণে দোযখে যাবে। যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা, কারো মনে কষ্ট দেয়া, কাউকে কটু কথা বলা, অন্যদের সাথে গীবতে অংশ নেয়া, কারো কষ্টে আনন্দ প্রকাশ করা ইত্যাদি। এ সকল গোনাহ্র কাজ যখন সে যবান দ্বারা করলো, তখন সে এর পরিণতিতে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হল। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ السِنَتِهِمْ.

অর্থাৎ ঃ অনেক মানুষ যবানের গোনাহের কারণে দোযখে যাবে। সুতরাং আল্লাহ্ পাকের দেয়া আমাদের এ যবানকে চিন্তা-ভাবনা করে, নিয়ন্ত্রণে রেখে, সহীহভাবে, ভাল কাজে ব্যবহার করা উচিত। আর এজন্যই বলা হয়েছে, হয়তো ভাল-নেক কাজের কথা বলো, নয়তো চুপ থাকো। কারণ খারাপ কথা বলার চেয়ে চুপ থাকা হাজার গুণ ভাল।

পহ্লে তোলো, ফের বোলো

অর্থাৎ প্রথমে চিন্তা-ভাবনা করে, ভাল-মন্দ বিচার করে, ওজন করে, প্রয়োজনীয়-উত্তম কথাই শুধু বলা উচিত। এজন্যই অধিক কথা বলতে বারণ করা হয়েছে। কারণ মানুষ যখন বেশি কথা বলবে, তখন যবানকে তার নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে যাবে। আর যখন যবান লাগামহীন তথা নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে যাবে তখন কিছু না কিছু অন্যায় কথা যবান থেকে প্রকাশ পাবেই। আর এর ফলশ্রুতিতে মানুষ গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে। এজন্য শুধুমাত্র প্রয়োজন মতই কথা বলবে। অপ্রয়োজনে-অহেতুক কথা বলবে না। যেমন এক বুযুর্গ বলেছেন, "পহ্লে তোলো (ওজন করো) ফের বোলো। (বল)" কারণ

যখন ওজন করে করে কথা বলার অভ্যাস করবে, তখন যবান নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে।

হযরত মিয়া সাহেব (রহঃ)

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা; হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহঃ) এর একজন উস্তায ছিলেন, যার নাম ছিল, হযরত মিয়া আসগর হোসাইন সাহেব, তিনি "মিয়া সাহেব নামেই অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি অনেক উচ্চ স্তরের বুযুর্গ ছিলেন যে, তাঁকে দেখলে সাহাবায়ে কিরামের কথা মনে পড়তো। তাঁর সাথে আমার পিতার খুবই ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিলো। যার দরুন তিনি হযরত মিয়া সাহেব (রহঃ) এর নিকট খুব বেশী যাইতেন। মিয়া সাহেবও তাকে খুবই স্নেহ করতেন। আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান বর্ণনা করেছেন যে, একবার আমি মিয়া সাহেব (মাওলানা শাহ্ আসগর হোসাইন) (রহঃ)-এর খিদমতে হাজির হলাম। তখন হযরত মিয়া সাহেব বললেন, দেখ! ভাই মৌলভী শফী' সাহেব! আজ আমাদের আলোচনা উর্দুতে নয়, বরং আরবীতে হবে। আমার আব্বাজান বলেন, একথা শুনে আমি খুব আশ্চর্যান্বিত হলাম। কারণ এর পূর্বে কখনো এরূপ হয়নি। আজ হযরত মিয়া সাহেবের কি খেয়াল হলো যে, আমাকে এখানে বসিয়ে আরবীতে আলোচনা করতে চাচ্ছেন। কাজেই আমি প্রশ্ন করলাম, হযরত! আরবীতে আলোচনা কেন হবে? তিনি বললেন, ব্যস এমনিই মনে খেয়াল হলো তাই। কিন্তু আমি যখন খুব বেশি পীড়াপিড়ী করলাম, তখন বললেন, আসল কথা হলো আমরা দুইজন যখন কথা বলি, তখন আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যায়, এদিক ওদিকের আলোচনা শুরু হয়ে যায়। ফলে অনেক সময় আমরা গলদ আলোচনায় লিপ্ত হয়ে যাই। এজন্যই আমি চিন্তা-করলাম, যদি আমরা আরবীতে আলোচনা করি তাহলে আমাদের যবান কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হবে। কারণ আরবী তুমিও সাবলিলভাবে বলতে পারো না। আর আমিও পারিনা কাজেই

কষ্ট করে আরবী বলতে গেলে যবান লাগামহীনভাবে চলতে পারবে না। এতে করে অপ্রয়োজনীয়-অহেতুক আলোচনা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে।

আমাদের দৃষ্টান্ত

অতঃপর হযরত মিয়া সাহেব (রহঃ) বললেন, আমাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে নিজ বাড়ী হতে প্রচুর টাকা পয়সা নিয়ে সফরে রওয়ানা হলো, কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌছার পূর্বেই তার প্রায় সকল টাকা-পয়সা শেষ হয়ে গেল। এখন অবশিষ্ট যে কয়টি টাকা আছে, তা সে খুব হিসেব করে করে, শুধুমাত্র একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে খুব মেপে মেপে খরচ করতে লাগলো, যেন সে কোন রকমভাবে গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে।

অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে যে জীবন দান করেছেন। এটা আমাদের গন্তব্যস্থলে (বেহেশ্তে) পৌছার জন্য টাকা পয়সা বা পাথেয়ের মত। কিন্তু আমরা আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময়কে অহেতুক নষ্ট করেছি। যদি আমরা একে সঠিকভাবে ব্যবহার করতাম, তাহলে আমাদের গন্তব্যস্থল (বেহেশ্তে) পৌছার রাস্তা সহজ ও কন্টকমুক্ত হয়ে যেত। অথচ আমরা এ মূল্যবান পুঁজিকে বসে বসে অহেতুক কথাবার্তায়, গল্পের আসর জমিয়ে, আরো নানাবিধ অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করে ফেলেছি। জানিনা জীবনের আর কতদিন অবশিষ্ট আছে! এখন মনে চায় জীবনে বাকী দিনগুলোকে খুব হিসেব করে, মেপে মেপে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করি।

যে সকল ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক এ ধরনের পবিত্র চিন্তা করার তৌফিক দান করেছেন, তাদের অবস্থা এমনই হয় যে, তারা একথা চিন্তা করেন যে, যখন আল্লাহ্ পাক যবান দান করেছেন, তখন এর যথাযথ ব্যবহার একান্ত জরুরী। সঠিক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে এর ব্যবহার হওয়া উচিত। কোন গলদ জায়গায় এর ব্যবহার যেন না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

যবানকে নিয়ন্ত্রিত করার উপায়

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ) যিনি নবীদের পরে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি। তিনি একদা স্বীয় যবানকে টেনে ধরে বসে ছিলেন এবং তা মোচড়াচ্ছিলেন, লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ আপনি কেন এমন করছেন? উত্তরে তিনি বললেন,

অর্থাৎ ঃ এ যবান আমাকে বড় বিপর্যয়ে ফেলেছে, এজন্য আমি একে নিয়ন্ত্রিত করতে চাচ্ছি। (মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি মুখে কংকর ঢেলে (এঁটে) বসেছিলেন, যেন বিনা প্রয়োজনে যবান থেকে কোন কথা বের না হয়।

মোটকথা, যবান এমন এক বস্তু যা দ্বারা মানুষ বেহেশ্‌তও অর্জন করতে পারে, দোযখও অর্জন করতে পারে। সুতরাং একে কন্ট্রোল করা প্রয়োজন। যেন এ যবান কোন খারাপ জায়গায় ব্যবহার না হয়। আর এর তরীকা (উপায়) হলো, বেশি কথা বলা থেকে বিরত থাকা। কেননা যত বেশি কথা বলবে, ততবেশি গোনাহে লিপ্ত হবে। কাজেই দেখা যায় যে, যখন নিজ সংশোধনে আগ্রহী কোন ব্যক্তি কোন হক্কানী পীর সাহেবের নিকট ইসলাহের জন্য গমন করেন, তখন পীর সাহেব প্রত্যেক ব্যক্তির উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপত্র নির্ধারণ করেন। অবশ্য অনেকের সংশোধনের জন্য শুধুমাত্র যবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা পত্র দিয়ে থাকেন।

যবানে তালা লাগাও

এক ব্যক্তি আমার আব্বা-মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ)-এর নিকট প্রায়ই আসতেন। কিন্তু আব্বাজানের সাথে তার কোন ইসলাহী সম্পর্ক ছিলো না। এমনিই তিনি সাক্ষাতের জন্য আসতেন। তিনি যখন কথা বলতে আরম্ভ করতেন, তখন আর থামার নাম নিতেন না। এক কাহিনী শেষ হলে, অন্য কাহিনী শুরু করে দিতেন। আব্বাজান অনেক কষ্টে সহ্য করতেন। সে এক দিন আব্বাজানের নিকট দরখাস্ত পেশ

করলো যে, আমি আপনার সাথে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই! আব্বাজান তার দরখাস্ত কবুল করলেন এবং বললেন, ঠিক আছে! তখন সে বললো, হযরত আমাকে পড়ার জন্য কোন অজীফা বাতলে দিন! আব্বাজান বললেন, তোমার অজীফাহ একটিই আর তাহলো, "তুমি তোমার যবানে তালা লাগিয়ে নাও, আর এই যবান যা সর্বদা বলতেই থাকে, একে কন্ট্রোল করো; তোমার জন্য এ ভিন্ন অন্য কোন অজীফা নেই।" সুতরাং পরবর্তিতে সে ব্যক্তি যখন নিজ যবানকে কন্ট্রোল করে ফেললো, তখন এর মাধ্যমেই তার ইসলাহ (সংশোধন) হয়ে গেল।

গল্প গুজবে যবানকে লিপ্ত রাখা

আমাদের সমাজে যবানকে গলদ ব্যবহারের যে ভয়াবহ প্রচলন আরম্ভ হয়েছে, এ খুবই মারাত্মক। দেখা যায় যে, যখন একটু অবসর পাওয়া গেল, তখন কোন ঘনিষ্ঠ পরিচিত জনকে এ বলে ডাকা হচ্ছে "এসো কিছুক্ষণ বসে গল্প-গুজব করি।" এ গল্প-গুজব কালে কখনো মিথ্যা বলা হচ্ছে, কখনো গীবত করা হচ্ছে, কখনো অন্যের সমালোচনা করা হচ্ছে, কখনো অন্যকে বিদ্রুপ করা হচ্ছে। যার ফলে আমাদের এক গল্পগুজবের আসর, হাজারও গোনাহের কারণ হয়ে থাকে। এজন্য প্রথমে যবানকে নিয়ন্ত্রণ করার গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। আল্লাহ্ পাক নিজ দয়ায় এর গুরুত্ব আমাদের অন্তরে পয়দা করে দিন। আমীন।

নারী সমাজ ও যবানের ব্যবহার

যদিও সমাজের সকল নাগরিকই যবানের গোনাহে লিপ্ত। কিন্তু হাদীছ শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের মাঝে যে সকল রূহানী (আধ্যাত্মিক) রোগের সন্ধান দিয়েছেন, তার মধ্যে অন্যতম রোগ হলো "যবান তাদের কন্ট্রোলে থাকে না।" হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "হে মহিলা সম্প্রদায়! আমি দোযখীদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক সংখ্যায় তোমাদেরকেই পেয়েছি।

অর্থাৎ দোযখে পুরুষের তুলনায় মহিলার সংখ্যা বেশি। তখন মহিলাগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর কারণ কি? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করলেন ঃ

تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ

অর্থাৎ ঃ তোমরা অভিশাপ অনেক কর এবং স্বামীদের নাশোকরীও অনেক করে থাকো, এ কারণে জাহান্নামে তোমাদের সংখ্যা বেশি।

লক্ষ্য করে দেখুন, উপরোক্ত হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুইটি কারণ (অর্থাৎ অভিশাপের আধিক্য এবং স্বামীর না শোকরী) বর্ণনা করেছেন, উভয়ের সম্পর্ক যবানের সাথে। এর দ্বারা একথাও জানা গেল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের মাঝে যে দু'টি রোগ নির্ণয় করেছেন তাহলো, যবানের বে মওকা ব্যবহার, যবানের গলদ ব্যবহার। অর্থাৎ অধিকাংশ তাদের যবানকে গোনাহের কাজে ব্যবহার করে থাকে। যেমন কাউকে অভিশাপ দিল, কাউকে ভর্ৎসনা করলো, কাউকে গালী দিল, কাউকে মন্দ বললো, কারো গীবত করলো, কারো চোগলখোরী করল, এ সব কিছুই যবানের গোনহের অন্তর্ভুক্ত।

জান্নাতে প্রবেশের গ্যারান্টি দিচ্ছি

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ ঃ যে ব্যক্তি আমাকে দু'টি জিনিষের যামানত তথা গ্যারান্টি দিবে, আমি তাকে জান্নাতের গ্যারান্টি দিচ্ছি। সে দু'টি জিনিষের মধ্যে

একটি হলো, সে ঐ জিনিষের গ্যারান্টি দিবে যা তার দুই চোয়ালের মাঝখানে আছে। অর্থাৎ যবান, সে একে খারাপ কাজে ব্যবহার করবে না। এই যবান দিয়ে সে মিথ্যা বলবে না, গীবত করবে না, কারো মনে কষ্ট দিবে না ইত্যাদি। আর অপরটি হলো, ঐ জিনিষের যামানত তথা গ্যারান্টি দিবে, যা তার দুই রানের মাঝখানে আছে, অর্থাৎ লজ্জাস্থান, যে সে এর গলদ (হারাম) ব্যবহার করবে না। তাহলে আমি তাকে বেহেশ্‌তী হওয়ার গ্যারান্টি দিচ্ছি। এর দ্বারা জানা গেল যে, যবানের হিফাযত দ্বীন হিফাযতের অর্ধাংশ। দ্বীনের অর্ধাংশ যবানের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের জীবনের অর্ধেক গোনাহ্ যবানের দ্বারা হয়ে থাকে। কাজেই যবানের হিফাযত করা আবশ্যক।

নাজাতের জন্য তিনটি কাজ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضـ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ

অর্থ ঃ হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নাজাতের (মুক্তির) উপায় কি?

অর্থাৎ ঃ পরকালে দোযখের আযাব থেকে মুক্তির, আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভ ও বেহেশ্‌তে প্রবেশের উপায় কি? এর উত্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি কথা বলেছেন, প্রথম কথাটি হলো, তোমরা নিজের যবানকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখবে, তোমাদের যবান যেন কখনও তোমাদের কন্ট্রোলের বাইরে না যায়। দ্বিতীয় কথাটি হলো, তোমাদের বাড়ি যেন তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়, অর্থাৎ তোমরা তোমাদের বেশির ভাগ সময় নিজ নিজ বাড়িতে কাটাবে, অহেতুক-বিনা প্রয়োজনে বাড়ী থেকে বাইরে বের হবে না। কেবলমাত্র

প্রয়োজন হলেই বাহিরে যাবে, প্রয়োজন না থাকলে বাইরে যাবে না, যেন বাইরে যে সকল ফিত্না আছে তা থেকে বেঁচে থাকতে পারো।

গোনাহের কারণে কাঁদো

আর তৃতীয় কথাটি হলো যে, যদি তোমার থেকে কোন ভূল-ত্রুটি, অন্যায় কিংবা পাপ হয়ে যায়, তাহ্লে, তা স্মরণ করে কাঁদো। কাঁদার অর্থ হলো, তা থেকে তৌবা করো, তার উপর অনুতপ্ত হয়ে ইস্তিগফার করো। কাঁদার অর্থ এ নয় সত্যি সত্যি এর উপর কান্নাকাটি শুরু করে দিবে। যেমন কয়েক দিন আগে আমাকে এক ব্যক্তি বললো, আমার তো কান্না আসেই না, এজন্য আমি খুব পেরেশান! আসল কথা হলো যদি এমনিতে কান্না না আসে তাহলে, কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু গোনাহের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে, আল্লাহ্ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা যে, হে আল্লাহ্! আমি অন্যায় করেছি, আমি ভুল করেছি, আমাকে মেহেরবাণী করে মাফ করে দাও।

হে যবান আল্লাহ্‌কে ভয় করো

وعن ابى سعيد الخدرى رضـ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال

اذا اصبح ابن آدم، فان الاعضاء كلها تكفر اللسان، تقول

اتق الله فينا، فانما نحن بك فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন সকাল হয়, তখন মানুষের শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যবানকে সম্বোধন করে বলে, হে যবান! তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করো। কেননা আমরা তোমার অধীনস্থ, যদি তুমি ঠিক থাকো, তাহলে আমরাও ঠিক থাকবো। আর যদি তুমি বাঁকা হয়ে যাও তাহলে, আমরাও বাঁকা হয়ে যাবো। অর্থাৎ মানুষের পূর্ণ শরীর যবানের অধীন। কাজেই যদি যবান গোনাহের

কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে এর ফলশ্রুতিতে পূর্ণ শরীর পাপাচারে ডুবে যাবে। এ কারণেই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যবানকে বলে যে, তুমি ঠিক থেকো, অন্যথায় তোমার অন্যায় কাজের ফলে আমরাও মুসিবতে পড়ে যাবো। এখন প্রশ্ন হলো, সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিভাবে যবানকে সম্বোধন করে? এর উত্তর হলো, হতে পারে সত্যি সত্যিই যবানকে বলে থাকে, আল্লাহ্ পাক সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাক শক্তি দান করে থাকেন, যার ফলে তারা যবানের সাথে কথা বলে থাকে। কেননা যবানকেও বাকশক্তি আল্লাহ্ পাকই দান করেছেন, আর ক্বিয়ামতের দিন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্ পাকই বাকশক্তি দান করবেন। কাজেই এখনও বাকশক্তি দান করাটা আল্লাহ্ পাকের জন্য কোন কঠিন কাজ নয়।

কিয়ামতের দিন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলবে

পূর্বকালে এক সময় নেচারিয়্যাত তথা প্রকৃতিবাদের খুব জোর ছিল। আর এ প্রকৃতিবাদের প্রবক্তা ও অনুসারীগণ মু'জিযা বা কারামত ইত্যাদির অস্বীকার করতো, আর বলতো, এগুলোতো ফিত্রত তথা স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থি। এগুলো কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এ ধরনের এক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহঃ) এর নিকট প্রশ্ন করলো, কুরআন শরীফে যে বর্ণিত হয়েছে, ক্বিয়ামতের দিন এ হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে, এ কিভাবে সম্ভব হবে! এগুলোর তো যবান নেই? যবান ছাড়া কিভাবে কথা বলবে? এর উত্তর দেওয়ার পূর্বে হযরত থানভী (রহঃ) পাল্টা ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, যবানের জন্য ভিন্ন দ্বিতীয় আরেকটি যবান নেই। তাহলে, সে কিভাবে কথা বলে? যবানতো একটি গোস্তের টুকরা বৈ নয়? তার জন্য ভিন্ন কোন যবান নেই, তা সত্ত্বেও সে সর্বদা বলেই যাচ্ছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যখন আল্লাহ্ পাক গোস্তের একটি টুকরাকে বাক শক্তিদান করেছেন, যার ফলে এ গোস্তের টুকরাও কথা বলতে সক্ষম হচ্ছে, কিন্তু যদি আল্লাহ্ পাক এর বাক শক্তি ছিনিয়ে নেন, তাহলে এর কথাবার্তা বলাও বন্দ হয়ে যাবে। কাজেই এ বাক শক্তিই যখন আল্লাহ্

পাক হাত-পা বা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দান করবেন তখন তারাও কথা বলতে আরম্ভ করবে।

মোটকথা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা বলাটা হাকীকতও হতে পারে যে, সত্যি সত্যিই সকালে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যবানকে উদ্দেশ্য করে কথা বলে থাকে। আর রূপকার্থেও ব্যবহার হতে পারে যে, সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেহেতু যবানের অধীন, কাজেই যবানকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং একে সহীহ্ রাখার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চালাতে হবে।

মোটকথা যবানের হিফাযত করা অত্যন্ত জরুরী। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এঁকে নিয়ন্ত্রণ না করবে এবং একে গোনাহ্ থেকে বিরত না রাখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সফলকাম হতে পারবে না। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে যবানের হিফাযত করার এবং একে সহীহ্ভাবে ব্যবহার করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

গীবত একটি মারাত্মক গোনাহ্

তারিখ ও সময় ঃ ১০ই ডিসেম্বর ১৯৯৩ ঈসায়ী
শুক্রবার বাদ আসর
স্থান ঃ বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ
গুলশান ইকবাল, করাচী-পাকিস্তান।

বয়ানের সার সংক্ষেপ

গীবত (পরনিন্দা) এমন মারাত্মক কবীরাহ্ গোনাহ্। যেমন মদ পান করা কবীরাহ্ গোনাহ্। যেরূপভাবে মদ্যপান করা হারাম হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, তদ্রূপ গীবত হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এর কি কারণ যে আমরা মদ্য পান এবং যিনাকে তো হারাম মনে করি। কিন্তু গীবতকে হারাম মনে করি না। অথচ গীবত ও মারাত্মক হারাম। বরং হাদীস শরীফের ভাষায় যিনার চেয়ে মারাত্মক।

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:

গীবত একটি মারাত্মক গোনাহ্

ইমাম নববী (রহঃ) ঐ সকল গোনাহ্র আলোচনা আরম্ভ করেছেন, যা মুখ ও যবান থেকে প্রকাশ পায়। তিনি সর্বপ্রথম এমন একটি গোনাহ্র কথা উল্লেখ করেছেন, যা আমাদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। আর তা হলো গীবতের গোনাহ্। এটা এমন এক মহামারী যা আমাদের সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে, আমাদের কোন আলোচনা, আমাদের কোন বৈঠক এ জঘন্য পাপমুক্ত নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কুরআনে গীবত সম্পর্কে এমন কঠোর ও মারাত্মক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, এমন শব্দ সম্ভবতঃ অন্য কোন গোনাহ্ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়নি।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে।

ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا

فكرهتموه

অর্থ ঃ "তোমরা একে অন্যের গীবত করো না, (কেননা এটা এমন জঘন্য কাজ, যেমন নিজ মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া) তোমাদের কেউ

কি এ কথা পছন্দ করে যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাবে? তোমরা তো উহাকে অনেক খারাপ মনে করো।" কাজেই যখন তোমরা এটাকে খারাপ মনে করো, গীবতকেও ঘৃণা করো।

উপরোক্ত আয়াতের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন যে, এতে গীবতের কত মারাত্মক কদর্যতা বর্ণনা করা হয়েছে। একেতো মানুষের গোস্ত খাওয়া এবং "আদমখোর" (মানুষ খেকো) হওয়া কত বড় ঘৃণার কথা, তদুপরি আপন ভাইয়ের গোস্ত; সে ভাইও আবার মৃত। নিজ মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া যেমন বীভৎস কাজ, তদ্রুপ অন্যের গীবত করাও জঘন্য ও মারাত্মক অন্যায় কাজ।

গীবত কাকে বলে

গীবত বলা হয় কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ নিয়ে আলোচনা করাকে, যদিও সে প্রকৃতপক্ষে সে দোষে দোষী হয় এবং ঐ দোষ তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ কারো দোষ নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করা যে, সে যদি তা শুনতো মনে কষ্ট পেত। এক্ষেত্রে উক্ত আলোচনা গীবত বলে গণ্য হবে। হাদীস শরীফে আছে যে, এক সাহাবী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন! ইয়া রাসূলাল্লাহ! "গীবত" কাকে বলে? তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ

অর্থাৎ ঃ নিজ ভাইয়ের আলোচনা তার অনুপস্থিতিতে এমনভাবে করা যা সে পছন্দ করে না। অর্থাৎ যদি সে জানতে পারে যে আমার আলোচনা অমুক মজলিসে এভাবে করা হয়েছে, তাহলে তার কষ্ট হয় এবং সে সেটাকে খারাপ মনে করে, তাহলে তা গীবত হবে। সে সাহাবী পুনরায় প্রশ্ন করলেন।

আমি যে দোষ নিয়ে আলোচনা করছি তা যদি সত্যিকার অর্থেই আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। যদি ঐ দোষ প্রকৃত পক্ষে তার মধ্যে থাকে তাহলেই তো গীবত হবে। আর যদি ঐ দোষ তার মধ্যে না থাকে, তোমরা তাকে

মিথ্যাভাবে দোষারোপ করো, তাহলে তা গীবত নয়, বরং অপবাদ হয়ে যাবে এবং এতে দ্বিগুণ গোনাহ্ হবে। (আবু দাউদ শরীফ, গীবত অধ্যায়, হাদীস নম্বর ৪৮৭৪)

এখন আমাদের আলোচনার মজলিস ও আমাদের সভা সমিতির প্রতি একটু লক্ষ্য করুন যে, এ মারাত্মক পাপের প্রচলন কত ব্যাপকভাবে হচ্ছে। আমরা দিনরাত এ জঘন্য পাপে ডুবে আছি। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে হিফাযত করুন। আমীন। অনেকে গীবতকে জায়িয করার জন্য বলে থাকে যে, আমিতো গীবত করছি না, আমি একথা তার মুখের উপরও বলতে পারবো। অর্থাৎ সে বলতে চায় যে, আমি যখন একথা তার মুখের উপর বলতে পারি, তাহলে আমার জন্য গীবত করা জায়িয আছে। ভাই মনে রেখ! তুমি একথা তার মুখের উপর বলতে পারো আর না পারো তা সর্ব অবস্থায়ই গীবত। যদি তুমি কারো দোষ নিয়ে আলোচনা করো, তাহলে তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবেই, আর এহেন কাজ কবীরাহ্ গোনাহ্।

গীবত করা কবীরাহ্ গোনাহ্

মদপান করা, ডাকাতী করা, ব্যভিচার করা যেরূপভাবে কবীরাহ্ গোনাহ্র অন্তর্ভূক্ত, তদ্রুপ গীবত করাও কবীরাহ্ গোনাহ্র মধ্যে শামিল। গীবতের কবীরাহ্ গোনাহ্ আর অন্যান্য কবীরাহ্ গোনাহের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অন্যগুলোও সন্দেহাতীতভাবে হারাম আর এটাও নিঃসন্দেহে হারাম বরং গীবতের গোনাহ্ এদিক দিয়ে আরো বেশি মারাত্মক যে, এর সম্পর্ক হুকূকুল ই'বাদের (বান্দার হক্কের) সাথে। আর হুকূকুল ই'বাদ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাফ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ গোনাহ্ মাফ হবে না। অন্যান্য গোনাহ্ শুধু তৌবার দ্বারাই মাফ হয়ে যায়, কিন্তু গীবতের গোনাহ্ তৌবার দ্বারাও মাফ হবে না। এতেই এ গোনাহ্র ভয়াবহতা বুঝে আসে। আল্লাহ্র ওয়াস্তে এখন থেকে এ পণ করে নিন যে, কারো গীবত করবোও না, কারো গীবত শুনবোও না এবং যে মজলিসে

গীবত শুরু হবে সে মজলিসের আলোচনার মোড় অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবো, অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিবো। আর যদি আলোচনার মোড় পাল্টাতে সক্ষম না হই, তাহলে ঐ মজলিস ছেড়ে চলে যাবো। কেননা গীবত করা যেমন হারাম, শোনাও তেমনি হারাম।

গীবতকারী নিজ চেহারা খামচাবে

عَنْ انس بن مَالكٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هولاء يا جبرائيل؟ قال هولاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট খাদিম ছিলেন। দশ বৎসর পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মিরাজের রাতে যখন আমাকে উর্ধ্বজগতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন সেখানে আমাকে (দোযখ ভ্রমণকালে) এমন লোকদের দেখানো হয়েছিলো, যারা স্বীয় নখ দিয়ে আপন চেহারার গোস্ত খামচিয়ে ছিড়ছে। আমি হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালামকে প্রশ্ন করলাম, এদের পরিচয় কি? এরা কারা? তিনি উত্তরে বললেন, এরা ঐ সকল লোক যারা দুনিয়াতে মানুষের গোস্ত খেত (অর্থাৎ মানুষের গীবত করতো) এবং মানুষের সম্ভ্রমের উপর হামলা করতো। (আবু দাউদ শরীফ, গীবত অধ্যায়, হাদীস নম্বর ৪৮৭৮)

গীবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক

যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মারাত্মক গোনাহ্কে সাহাবায়ে কিরামের সামনে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন, কাজেই এ সম্পর্কে আলোচনা করার সময় সবগুলো হাদীসের প্রতি খেয়াল রাখা দরকার, যাতে এর ভয়াবহতা ও কদর্যতা আমাদের অন্তরে বসে যায়। আল্লাহ্ পাক নিজ দয়ায় এর ভয়াবহতা আমাদের অন্তরে বসিয়ে দিন এবং এ মারাত্মক ও জঘন্য পাপ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দিন, আমীন। উপরোক্ত হাদীসে আপনারা জানতে পেরেছেন যে, আখিরাতে গীবতের শাস্তি এ হবে যে, গীবতকারী স্বীয় চেহারা নিজ নখ দিয়ে খামচাতে থাকবে।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে (যা সনদের দিক দিয়ে তেমন মজবুত নয়, কিন্তু অর্থ হিসেবে সহীহ্) আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গীবতের গোনাহ্ ব্যভিচারের গোনাহ্র চেয়েও মারাত্মক। এর কারণ বলেছেন, খোদা না করুন কেউ যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে যখন সে কৃতকার্যের উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তৌবা করে নিবে, তখন ইনশাআল্লাহ ঐ গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু গীবত এমন মারাত্মক গোনাহ্ যে এটা ঐ সময় পর্যন্ত মাফ হবে না, যতক্ষণ না যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ করবে। তাহলে চিন্তা করে দেখুন এটা কত মারাত্মক গোনাহ্। (মাজমাউজ্জাওয়ায়েদ গীবত অধ্যায় ৮ম খণ্ড ৯১ পৃঃ)

গীবতকারীকে জান্নাতে যেতে বাধা দেওয়া হবে

একটি হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যারা অপরের গীবত করে, দুনিয়াতে তারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে হয়তো সৎকর্মশীল হবে, নামায পড়বে, রোযা রাখবে, অন্যান্য ইবাদাত করবে, কিন্তু যখন তারা পুলসিরাত পার হতে যাবে, [আপনারা জানেন, জাহান্নামের উপরে পুলসিরাত নামে একটি পুল আছে, সকলকেই ঐ পুল পার হতে হবে, যে ব্যক্তি জান্নাতী হবে সে

সহজেই ঐ পুল পেরিয়ে বেহেশ্‌তে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন আর যে জাহান্নামী হবে, তাকে ঐ পুলের উপর থেকে টেনে নামিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন তাদেরকে বাধা দিয়ে বলা হবে, তোমরা আগে যেতে পারবে না, যাবত না গীবতের কাফ্‌ফারা আদায় করবে, অর্থাৎ যাদের গীবত করেছো তাদের নিকট মাফ চেয়ে তাদের ক্ষমা লাভ না-করা পর্যন্ত বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না।

গীবত জঘন্যতম সুদ

একটি হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনও বলেছেন যে, সুদ এমন মারাত্মক গোনাহ্ যে, এতে অসংখ্য দোষ রয়েছে, এটা অনেক পাপের সমষ্টি, সুদের সবচেয়ে ছোট গোনাহ্ (আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে রক্ষা করুন) হলো, যেমন কেউ নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো। চিন্তা করুন, সুদের ব্যাপারে এমন মারাত্মক ধমকি (হুঁশিয়ারী) এসেছে যে, এমন মারাত্মক হুঁশিয়ারী অন্য কোন গোনাহ্ সম্পর্কে আসেনি। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সবচেয়ে জঘন্য সুদ হলো যে কেউ তার মুসলমান ভাইয়ের ইয্‌যতের উপর আক্রমণ করে," অর্থাৎ কারো গীবত করে। কত মারাত্মক হুঁশিয়ারী। (আবু দাউদ শরীফ, গীবত অধ্যায়, হাদীস নম্বর ৪৮৭৬)

গীবত মৃত ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ

হাদীস শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের দু'জন রোযাদার মহিলার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা রোযাদার অবস্থায় আলোচনা শুরু করে গীবতে লিপ্ত হয়ে গেল; অন্য কারো সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে তার গীবতও শুরু করে দিলো। কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এসে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দু'জন মহিলা রোযা রেখেছিলো

এখন তাদের অবস্থা খুবই আশংকাজনক, পিপাসায় তাদের প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, তারা মৃতপ্রায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভবতঃ অহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে মহিলাদ্বয় গীবত করেছে। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম করলেন যে, ঐ মহিলাদেরকে আমার নিকট নিয়ে এসো, যখন তাদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির করা হলো, তখন তিনি দেখলেন সত্যিই তারা মৃতপ্রায়। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম করলেন যে, একটি বড় পেয়ালা নিয়ে এসো, যখন পেয়ালা আনা হলো, তখন তিনি ঐ দু'জন মহিলা হ'তে একজনকে হুকুম দিলেন যে, তুমি এই পেয়ালার মধ্যে বমি করো, যখন ঐ মহিলা বমি করতে আরম্ভ করলো দেখা গেল বমির সাথে রক্ত, পুঁজ ও গোস্তের টুকরো বের হচ্ছে। অতঃপর অপর মহিলাকেও বমি করতে বললেন, যখন সে বমি করলো, তার বমির মধ্যেও রক্ত, পুঁজ ও গোস্তের টুকরো বের হলো এবং ঐ পেয়ালা ভরে গেল। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলো তোমাদের ঐ সকল ভাইবোনদের রক্ত, পুঁজ ও গোস্ত রোযা অবস্থায় তোমরা দু'জন যা খেয়েছো। (অর্থাৎ রোযা রেখে যাদের গীবত করেছিলে তাদেরই রক্ত, পুঁজ ও গোস্ত) তোমরা দু'জন রোযা রাখার কারণে জায়িয খানা (স্বাভাবিক পানাহার) থেকে তো নিজেকে বিরত রেখেছো, কিন্তু হারাম খানা (গীবত) অর্থাৎ অন্য মুসলমান ভাইয়ের রক্ত, পুঁজ ও গোস্ত খাওয়া ত্যাগ করতে পারো নাই। যার ফলে তোমাদের পেট এ সকল হারাম জিনিষে ভরে গিয়েছিলো। আর এ কারণেই তোমাদের দু'জনের এ অবস্থা হয়েছে। এরপর তিনি বললেন, ভবিষ্যতে কখনও গীবত করবে না। এ ঘটনায় আল্লাহ্ পাক গীবতের রূপক নমুনাও দেখিয়ে দিয়েছেন যে, গীবতের পরিনাম এমন মারাত্মক ও ভয়াবহ হয়ে থাকে।

আসলে আমাদের রুচির বিকৃতি ঘটেছে, অনুভূতিও শেষ হয়ে গেছে, যার ফলে পাপের ভয়াবহতা ও গোনাহের কদর্যতা আমাদের

অন্তর থেকে চলে গেছে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক যাদেরকে সুস্থ রুচি ও সঠিক অনুভূতি দান করেছেন, তাদেরকে গোনাহের ভয়াবহ পরিণতি কোন কোন সময় প্রত্যক্ষও করিয়ে থাকেন।

গীবত করার কারণে ভয়ংকর স্বপ্ন

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত রাবিয়ী নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একদা একটি মজলিসে গিয়ে আমি দেখলাম লোকেরা পরস্পরে আলোচনা করছে, আমিও তাদের সাথে বসে পড়লাম। আলোচনার এক পর্যায়ে কোন এক ব্যক্তির গীবত আরম্ভ হয়ে গেল। আমার নিকট তা খারাপ মনে হলো যে, এখানে এ মজলিসে বসে কারো গীবতে লিপ্ত হবো, কাজেই আমি সেখান থেকে চলে গেলাম। কেননা শরীয়তের বিধান হলো যে, যদি কোন মজলিসে গীবত হতে থাকে তাহলে ক্ষমতা থাকলে গীবত করা থেকে লোকদেরকে বাধা দিবে, বিরত রাখবে। আর যদি বাধা দেয়ার ক্ষমতা না থাকে তাহলে ঐ আলোচনায় শরীক হবে না। ঐ মজলিস ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে। সুতরাং আমিও উঠে অন্যত্র চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পর খেয়াল হলো সম্ভবতঃ এতক্ষণে ঐ মজলিসে গীবতের আলোচনা শেষ হয়ে গেছে, কাজেই আমি পুনরায় উক্ত মজলিসে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ এদিক ওদিকের আলোচনার পর পুনরায় গীবত শুরু হয়ে গেল, কিন্তু এবার আমার হিম্মত দুর্বল হয়ে গেল, আমি ঐ মজলিস ছেড়ে যেতে পারলাম না, প্রথমে অন্যদের গীবত শুনতে লাগলাম, এক পর্যায়ে আমি নিজেও গীবতের এক দু'টি বাক্য বলে ফেললাম। ঐ মজলিস থেকে বাড়িতে এসে রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে অত্যন্ত কৃষ্ণাঙ্গ এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, সে বড় একটি পেয়ালায় করে আমার জন্য গোস্ত নিয়ে এসেছে। আমি যখন ভালমত লক্ষ্য করলাম, তখন দেখলাম যে, উহা শুয়োরের গোস্ত, আর ঐ ভয়ানক কালো ব্যক্তি আমাকে বলছে যে, এই শুয়োরের গোস্ত খাও! আমি বললাম! "আমিতো মুসলমান শুয়োরের গোস্ত কিভাবে খাবো?" সেই ভয়ংকর লোকটি বললো, "না! তোমাকে এটা খেতেই হবে।

অতঃপর সে লোকটি ঐ গোস্তের টুকরো জোর করে আমার মুখে পুরে দিতে আরম্ভ করলো। আমি যতই বারণ করি সে ততই জোরপূর্বক মুখে ঢুকাতে লাগলো, এমন কি আমার বমির উদ্বেগ হওয়া সত্ত্বেও সে আমাকে নিস্তার দিলোনা। এ দারুন কষ্টকর অবস্থায় আমার চোখ খুলে গেল। জাগ্রত হওয়ার পর যখন আমি খাওয়ার সময় খাবার খেলাম তখন স্বপ্নের সেই শুয়োরের গোস্তের দুর্গন্ধ ও কদর্যতা আমার খাদ্যে অনুভূত হলো। সুদীর্ঘ ত্রিশ দিন পর্যন্ত আমার এ অবস্থা অব্যাহত রইলো যে, যখনই খানা খেতে বসি তখন সকল খাদ্যেই সেই শুয়োরের গোস্তের মারাত্মক দুর্গন্ধ অনুভূত হয়।

এ ঘটনা দ্বারা আল্লাহ্ পাক আমাকে সতর্ক করলেন যে, উক্ত মজলিসে আমি যে সামান্য গীবত করেছিলাম তার পরিনাম কত ভয়াবহ যে, ত্রিশ দিন পর্যন্ত বরাবর আমি তা অনুভব করতে থাকি। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে গীবত করা ও শোনা থেকে হিফাযত করুন। আমীন।

হারাম খাদ্যের কলুষতা

আসল কথা হলো, পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের অনুভূতিও নষ্ট হয়ে গেছে। যার দরুন এখন আর পাপকে পাপ বলে মনে হয় না। হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব নানূতূবী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, একবার কোন এক জায়গায় দাওয়াতে গিয়ে দু'এক লোকমা সন্দেহযুক্ত খানা খেয়ে ফেলেছিলাম, সুদীর্ঘ কয়েক মাস পর্যন্ত এর কলুষতা আমার অন্তরে অনুভূত হয়েছে। কেননা উক্ত খানা হারাম হওয়ার সন্দেহ ছিলো, তা খাওয়ার পর বার বার অন্তরে খারাপ চিন্তা এসেছে, গোনাহ্ করার ইচ্ছে মনে জাগ্রত হতো, গোনাহ্র প্রতি আন্তরিক আগ্রহ অনুভূত হতো।

গোনাহের কারণে অন্তরে কলুষতা ও অন্ধকারের সৃষ্টি হয় যার ফলশ্রুতিতে গোনাহ্ করার আগ্রহ বেড়ে যায় এবং মানুষ পাপ কাজের দিকে অগ্রসর হয়। আল্লাহ্ পাক আমাদের অনুভূতিকে সুস্থ করে দিন।

আমীন। মোটকথা গীবত খুবই মারাত্মক গোনাহ্‌র কাজ। আল্লাহ্ পাক যাকে সুস্থ অনুভূতি দান করেছেন সে বুঝতে পারে যে, আমি কত বড় মারাত্মক পাপে লিপ্ত আছি।

যে সকল ক্ষেত্রে গীবত করা জায়িয

গীবতের সংজ্ঞা আমি পূর্বেই আপনাদের নিকট বর্ণনা করেছি যে, কারো অনুপস্থিতিতে তার আলোচনা এরূপভাবে করা, যদি সে জানতে পারে যে, আমার আলোচনা এরূপভাবে করা হয়েছে, তাহলে মনে কষ্ট পাবে, চাই সে আলোচনা সঠিকই হোক না কেন। অবশ্য এখানে একটি বিষয় খুব ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, শরীয়তে সব জিনিষের প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে সে অনুযায়ী বিধান ও আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মানুষের স্বভাবের প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে, মানুষের প্রয়োজনের প্রতিও সুক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা হয়েছে। আর এদিকে লক্ষ্য করেই কয়েকটি বিষয়কে গীবতের বহির্ভূত রাখা হয়েছে, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা গীবত বলেই মনে হয়, কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে তা জায়িয।

কারো অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য গীবত করা জায়িয

যেমন কেউ এমন কাজ করছে, যার দ্বারা অন্য লোকের ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে, এখন যদি ঐ লোকের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সতর্ক না করা হয়, তাহলে সে ঐ ব্যক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ সময় যদি আপনি ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলে দেন যে তোমার বিরুদ্ধে অমুক ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করছে কাজেই তুমি সতর্ক থেকো, তাহলে তা জায়িয হবে। এটা স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা, তিনি সবকিছু শিক্ষা দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে বসাছিলাম, এমতাবস্থায় সামনের দিক থেকে একটি লোককে আমাদের দিকে

আসতে দেখা গেল, সে রাস্তায় থাকাকালীন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে ইশারা করে আমাকে বললেন,

অর্থাৎ ঃ এ লোকটি তার গোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি একটু সতর্ক হয়ে বসলাম। কারণ খারাপ লোক থেকে সাবধান থাকা উচিত। যখন ঐ লোকটি মজলিসে এসে বসলো, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী নম্রভাবে কথাবার্তা বললেন। ঐ ব্যক্তি চলে যাওয়ার পর হযরত আয়েশা (রাঃ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি বলেছিলেন এ ব্যক্তি তার গোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি, অথচ সে যখন এসে আপনার মজলিসে বসলো, তখন আপনি তার সাথে নম্রভাবে মিষ্ট ভাষায় কথা বললেন, এর কারণ কি?" মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, "দেখ! এ ব্যক্তি এমন জঘন্য যে তার অনিষ্টের ভয়ে লোকেরা তাকে ছেড়ে দেয়।" অর্থাৎ এ ব্যক্তি প্রকৃতি ও স্বভাবগতভাবেই বিশৃংখল ও সন্ত্রাসী, যদি এর সাথে নম্র ব্যবহার না করা হয়, তাহলে সে সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণেই আমি আমার অভ্যাসমত তার সাথে নম্র ব্যবহার করেছি।" (তিরমিজী শরীফ, হাদীস নম্বর ১৯৯৬)

উলামায়ে কিরাম এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ) কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন, "এ লোকটি তার গোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি, এটা বাহ্যিক দৃষ্টিতে গীবত, কেননা তার অনুপস্থিতিতে তার দোষ নিয়ে আলোচনা করা হল। তা সত্ত্বেও এটা এজন্য জায়িয হয়েছে যে, এর দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিলো হযরত আয়েশা (রাঃ) কে সতর্ক করা, যাতে ভবিষ্যতে তিনি এ ব্যক্তির কোন ফ্যাসাদের শিকার না হন। এ হাদীসের আলোকে একথা বুঝা গেল যে, কাউকে অন্যের ষড়যন্ত্র ও অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য যদি তার অনুপস্থিতিতে তার দোষ আলোচনা করা হয়, তাহলে তা গীবত

বলে গণ্য হবে না, আর এরূপ দোষ চর্চা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম নয়, বরং জায়িয।

যদি কারো প্রাণ নাশের আশংকা হয়

কোন কোন অবস্থায় অন্যের দোষ বর্ণনা করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যেমন আপনি কাউকে দেখলেন যে, সে কারো উপর আক্রমণ করার এবং তাকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাহলে এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে একথা বলা যে, "তোমার জীবন হুমকির সম্মুখীন", যাতে করে সে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে গীবত করা জায়িয হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গোনাহ্‌র কাজ করে তার গীবত

একটি হাদীস বর্ণিত আছে, যার সঠিক মর্মার্থ লোকেরা বুঝে না, সে হাদীসটি হলো, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا غِيبَةَ لِفَاسِقٍ وَلَا مُجَاهِرٍ

অর্থাৎ ঃ ফাসিকের গীবত করলে তা গীবত বলে গণ্য হবে না। (জামেউল উসূল, ৮ম খণ্ড ৪৫০ পৃঃ)

অনেকে এ হাদীসের অর্থ এরূপ বুঝে থাকে যে, কেউ যদি কোন কবীরাহ্ গোনাহে্ লিপ্ত হয়, অথবা কেউ যদি বিদআ'তে লিপ্ত হয়, তাহলে যেভাবে ইচ্ছা তার গীবত করতে থাকো, এতে কোন গোনাহ্ নেই। এটা জায়িয। অথচ প্রকৃত পক্ষে এ হাদীসের এ অর্থ নয়, বরং এর অর্থ হলো-যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপ ও অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে, যেমন, এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে কোন প্রকার সংকোচ ছাড়াই মদ পান করে থাকে, এ অবস্থায় যদি কেউ তার অনুপস্থিতিতে অন্য কারো নিকট এ কথা বলে যে, সে মদ পান করে, তাহলে তা গীবত বলে গণ্য হবে না। কেননা সে নিজে প্রকাশ্যে মদ পান করার মাধ্যমে যেন ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে যে, আমি মদ পান করি। এ অবস্থায় যদি তার

অনুপস্থিতিতে কেউ একথা আলোচনা করে তাহলে তার মনে কষ্ট হবে না। কাজেই তা গীবত বলে গণ্য হবে না।

এটাও গীবত বলে গণ্য

কিন্তু যে সকল দোষ সে অন্য লোক থেকে গোপন রাখতে চায়, যদি তা নিয়ে আপনি তার অনুপস্থিতিতে অন্যদের সাথে আলোচনা করেন, তাহলে তা গীবত বলে গণ্য হবে। যেমন সে প্রকাশ্যে মদ পান করে, প্রকাশ্যে সুদও খায়, কিন্তু কোন পাপ এমন আছে যা সে গোপনে করে এবং মানুষের নিকট তা প্রকাশ করতে চায় না এবং সে পাপও এমন যে তার ক্ষতি ঐ পাপী ব্যক্তি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে, অন্যেরা এতে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না, তাহলে এক্ষেত্রে তার এই পাপের আলোচনা করা তথা তার গীবত করা জায়িয নয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, যে সকল গোনাহ্ মানুষ প্রকাশ্যে করে থাকে তার আলোচনা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়, আর যা গোপনে করে থাকে তার আলোচনা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত। এটাই উপরোক্ত হাদীসের অর্থ।

ফাসিক ও পাপীর গীবতও জায়িয নয়

হযরত থানভী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক মজলিসে হযরত ওমর (রাঃ) এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন, উক্ত মজলিসে এক ব্যক্তি হাজ্জায বিন ইউসুফের সমালোচনা শুরু করলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "দেখো! তুমি যে তার সমালোচনা করছো, এটা গীবত" আর তুমি এও মনে করো না যে, হাজ্জায বিন ইউসুফ শত শত লোকের হত্যার অপরাধে অপরাধী বলে তার গীবত করা হালাল হয়ে গেছে। ভালমত জেনে রেখ! তার গীবত করা হালাল হয়নি, বরং আল্লাহ্ পাক যেমনিভাবে হাজ্জায বিন ইউসুফ থেকে শত শত মানুষের রক্তের হিসেব নিবেন, তেমনিভাবে তুমি যে তার অনুপস্থিতিতে তার গীবত করছো এরও হিসেব নিবেন। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে হিফাযত করুন। আমীন।

কাজেই একথা মনে না করি যে, অমুক ব্যক্তি ফাসিক, পাপী এবং বিদআ'তী কাজেই মন ভরে তার গীবত করে নাও, এ চিন্তা একান্তই

ভ্রান্ত। অতএব এ ধরনের লোকের গীবত করা থেকেও বেঁচে থাকা ওয়াজিব।

জালিমের জুলুমের আলোচনা গীবত নয়

আরো একটি জায়গায় শরীয়ত গীবতের অনুমতি দিয়েছে। তাহলো, এক ব্যক্তি তোমার উপর অত্যাচার করলো, এখন যদি তুমি ঐ অত্যাচারের কথা অন্য কোন ব্যক্তিকে বলো যে, আমার উপর এ অত্যাচার করা হয়েছে, আমার সাথে এ অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে, তাহলে তা গীবত বলে গণ্য হবে না, এতে কোন প্রকার গোনাহ্ও হবে না। যার নিকট তুমি এ আলোচনা করছো চাই সে এর প্রতিকার করতে সক্ষম হোক বা না হোক। যেমন কোন ব্যক্তি তোমার কোন জিনিষ চুরি করলো, এখন যদি তুমি থানায় গিয়ে তার বিরুদ্ধে চুরির মামলা দায়ের করো, তাহলে যদিও এটা তার অনুপস্থিতিতে তার দোষ চর্চা, কিন্তু এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়, কেননা সে তোমার ক্ষতি করেছে, তোমার উপর অত্যাচার করেছে, তারপর তুমি থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছো। থানা কর্তৃপক্ষ তোমার অত্যাচারের বিচার করবেন, কাজেই তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

তদ্রুপ এ চুরির আলোচনা যদি এমন লোকের নিকটও করা হয়, যে এর প্রতিকার করতে সক্ষম নয়। যেমন চুরির খবর পেয়ে কিছু লোক তোমার বাড়িতে এসে একত্রিত হলো, তুমি তাদের নিকট বলে ফেললে যে, আজ রাতে অমুক ব্যক্তি আমার বাড়িতে চুরি করেছে, অথবা অমুক ব্যক্তি আমার এই ক্ষতি করেছে, অথবা অমুক ব্যক্তি আমার উপর এই অত্যাচার করেছে, তাহলে এ আলোচনায় কোন গোনাহ্ নেই, কেননা এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

লক্ষ্য করে দেখুন! শরীয়ত আমাদের মেজাযের প্রতি কতটুকু সূক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেছে, কারণ মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি এমন যে, যখন সে কোন কষ্ট পায় তখন কমপক্ষে এতটুকু চায় যে, এ দুঃখ বা কষ্টের আলোচনা অন্যের নিকট করে মনকে হাল্কা করে। আর এ সময়

এদিকে খেয়াল থাকে না যে, এ ব্যক্তি তার কষ্টের প্রতিকার করতে পারবে কিনা! এক্ষেত্রে শরীয়তও অনুমতি দিয়েছে যে সে এটা অন্যের নিকট ব্যক্ত করতে পারবে। যেমন কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে,

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ

অর্থ ঃ আল্লাহ্ পাক কোন মন্দ বিষয়কে প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। অবশ্য যার উপর জুলুম করা হয়েছে তার কথা আলাদা। অর্থাৎ সে তার অত্যাচারিত হওয়ার কাহিনী অন্যের নিকট আলোচনা করতে পারে। এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং জায়িয।

মোট কথা উপরোক্ত বিষয়গুলোকে আল্লাহ্পাক গীবতের আওতা থেকে বাইরে রেখেছেন, অর্থাৎ এর দ্বারা গীবতের গোনাহ্ হবে না। কিন্তু এগুলো ব্যতীত আমরা আমাদের মজলিসগুলোতে সময় কাটানোর বাহানায়, গল্পচ্ছলে অন্যের যে দোষ চর্চা শুরু করে দেই, তা সবই গীবতের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আল্লাহ্র ওয়াস্তে নিজের প্রতি দয়া করে এ মহামারী প্রতিরোধের ব্যবস্থা করুন। নিজের মুখকে সংযত রাখুন। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে এ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দিন। আমীন।

গীবত থেকে বেঁচে থাকার শপথ

গীবতের আলোচনা আপনাদের সম্মুখে বিস্তারিতভাবে করা হলো, আপনারা তা শুনেছেনও বটে। তবে কেবলমাত্র এক কানে শুনে অপর কান দিয়ে বের করে দিলে চলবে না, বরং অন্তরের কান দিয়ে আ'মলের নিয়তে শুনতে হবে এবং সাথে সাথে এ শপথ করতে হবে যে, "ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে কোন দিন এ মুখ থেকে গীবতের একটি শব্দও উচ্চারিত হবে না।" আর যদি কখনও ভুলে মুখ থেকে গীবত সংক্রান্ত কোন শব্দ বের হয়ে যায় তাহলে, সাথে সাথে তৌবা করে এর যথাযথ প্রতিকার করবে। গীবতের সহীহ্ চিকিৎসা হলো, যার গীবত

করা হয়েছে তার নিকট গিয়ে একথা বলা যে, ভাই! আমি তোমার গীবত করেছি, আমাকে মেহেরবাণী করে মাফ করে দাও। আল্লাহ্ পাকের কিছু খাস (বিশেষ) বান্দা এমনও আছেন যারা যথার্থই এমন করে থাকেন।

গীবত থেকে বাঁচার উপায়

হযরত থানভী (রহঃ) বলেছেন, কোন কোন লোক আমার নিকট এসে বলে যে, "আমি আপনার গীবত করেছি, মেহেরবানী করে আমাকে মাফ করে দিন।" আমি তাদেরকে বলি "এক শর্তে আমি তোমাকে মাফ করতে পারি, আর তাহলো, প্রথমে বলতে হবে আমার কি গীবত করেছো, যাতে করে আমি জানতে পারি যে, মানুষেরা আমার সম্পর্কে কি বলে থাকে। যদি আমার সামনে বলতে পারো তাহলে মাফ পাবে।" অতঃপর হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, "আমি তা এজন্য শুনে থাকি যে, হতে পারে আমার যে দোষ নিয়ে আলোচনা করেছে, তা প্রকৃত পক্ষেই আমার মধ্যে আছে, তাহলে সে সম্পর্কে আমি জানতে পারবো এবং তা থেকে আল্লাহ্ পাক আমাকে হয়তো বেঁচে থাকার তৌফিক দিবেন।"

সুতরাং যদি কোন সময় গীবত হয়েই যায়, তাহলে তার চিসিৎসা হলো, তাকে বলে দাও, "ভাই আমি তোমার গীবত করে ফেলেছি, মেহেরবানী করে আমাকে মাফ করে দাও।" একথা বলার সময় যদিও মনের উপর প্রচণ্ড আঘাত আসবে, হৃদয়ের উপর করাত চালাতে হবে, কারণ একথা বলা খুবই কষ্টকর, কিন্তু প্রকৃত চিকিৎসাও এটাই। দু'চারবার এ তদবীর মেনে চললে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা হয়ে যাবে। অবশ্য বুযুর্গানে দ্বীন গীবত থেকে বেঁচে থাকার অন্য চিকিৎসাও বলেছেন। যেমন হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন, "যখন অন্য লোকের মন্দ আলোচনা মুখে আসে, সাথে সাথে নিজের দোষের কথা চিন্তা করো। যেহেতু কোন মানুষই দোষমুক্ত নয়, কাজেই নিজের কথা কল্পনা করো যে, আমার মধ্যে তো এই দোষ আছে, আমি

অন্যের দোষ চর্চা কিভাবে করি এবং সাথে সাথে ঐ সকল আযাবের কথাও ভাবুন যা গীবতের কারণে হবে। যেমন গীবতের একটি বাক্যও যদি মুখ থেকে বের হয়ে যায় তাহলে এর পরিনাম কত ভয়াবহ হবে। আল্লাহ্ পাকের দরবারে এ দু'আও করতে থাকুন ঃ হে আল্লাহ্ আমাকে এ ভয়াবহ বিপদ হতে রক্ষা করো। যখন মজলিসে কোন লোকের দোষের আলোচনার সূচনা হয়, তখন সাথে সাথে আল্লাহ্ পাকের দিকে রুজু করে দু'আ করতে হবে, হে আল্লাহ! এ মজলিসে মানুষের গীবত শুরু হচ্ছে, আমাকে এ থেকে হিফাযত করুন, আমি যেন এ মারাত্মক আলোচনায় লিপ্ত না হই।

গীবতের কাফ্ফারা

একটি হাদীসে (যা সনদের দিক দিয়ে দুর্বল হলেও অর্থের দিক দিয়ে সহীহ্) বর্ণিত আছে যে, যদি কারো গীবত হয়েই যায়, তাহলে এর কাফ্ফারা হলো, যার গীবত করা হয়েছে তার জন্য বেশি বেশি দু'আ করা, ইস্তিগফার করা। যেমন আজ কারো হুশ হলো এবং সে ভাবলো যে আমিতো বিরাট অন্যায় করেছি, সারা জীবনতো শুধু মানুষের গীবত করেছি, কার কার গীবত করেছি তাও জানা নেই, ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ! আর কারো গীবত করবো না। কিন্তু অতীতে যাদের গীবত করেছি তাদেরকে কোথায় খুঁজে বেড়াবো, তাদের নিকট হ'তে মাফ-ই-বা কিভাবে নেবো? এ অবস্থায় তাদের জন্য দু'আ এবং ইস্তিগফার করা ছাড়া বাঁচার কোন পথ নেই। কাজেই তাদের জন্য দু'আও ইস্তিগফারই করতে হবে। (মিশকাত শরীফ যবানের হিফাযত অধ্যায় হাদীস নম্বর ৪৮৭৭-কিতাবুল আদাব)

কারো হক্ব নষ্ট হলে

কারো হক্ব নষ্ট হলে যে গোনাহ্ এবং শাস্তি হবে, এ থেকে বাঁচার উপায় কি? এ ব্যাপারে হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী সাহেব থানভী (রহঃ) এবং আমার শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব মুফতী

শফী সাহেব (রহঃ) একটি চিঠি লিখে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। সে চিঠিতে লিখা ছিলো "সমগ্র জীবনে আপনার কত হক্ব যে নষ্ট করেছি, তার হিসেব নেই, কত অন্যায় আপনার সাথে করেছি তারও ইয়ত্তা নেই, আমি সামগ্রিকভাবে সকল অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। এ চিঠি তাদের সাথে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তিকে পাঠিয়েছেন। আশা করা যায় যে, আল্লাহ্‌পাক এ চিঠির উসিলায় তাদেরকে অন্যের হক্ব নষ্ট করার গোনাহ্ থেকে মুক্তি দান করেছেন।

কিন্তু যদি এমন লোকের হক্ব নষ্ট করে থাকে যার থেকে এখন মাফ করানো সম্ভব নয়। কারণ হয়তো ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে নতুবা সে এমন জায়গায় আছে যার ঠিকানা জানা নেই কিংবা জানাও সম্ভব নয়। এ সকল অবস্থার জন্য হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন যে, যার গীবত করেছো কিংবা, যার হক্ব নষ্ট করেছো তার জন্য খুব বেশি বেশি দু'আ করো যে, হে আল্লাহ! আমি তার যে গীবত করেছি এবং তার হক্ব নষ্ট করেছি, এটাকে তার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ বানান এবং তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের উন্নতি দান করুন। সাথে সাথে বেশি বেশি তৌবা ও ইস্তিগফারও করবে। কারণ গোনাহ্ ও শাস্তি থেকে বাঁচার এও একটি উপায়। যদি আমরাও আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে এ ধরনের চিঠি লিখি তাহলে কি আমাদের নাক কাটা যাবে? নাকি আমাদের বে-ইজ্জতি হবে? যদি আমরাও হিম্মত করে এরূপ চিঠি লিখতে পারি, তাহলে এর উসিলায় আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে মাফও করে দিতে পারেন।

ক্ষমা চাওয়া ও ক্ষমা করার ফযিলত

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্ পাকের কোন বান্দা কারো নিকট ক্ষমা চায় এবং তা আন্তরিকভাবেই চায়। এখন যদি যার নিকট মাফ চাওয়া হয় সে ক্ষমা প্রার্থীর এ করুন ও লজ্জিত অবস্থা দেখে তাকে মাফ করে দেয়, তাহলে আল্লাহ্ পাকও তাকে সে কঠিন

দিনে মাফ করে দিবেন, যেদিন তার ক্ষমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে। আর যদি এমন হয় যে, এক ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে কারো নিকট মাফ চাচ্ছে, অথচ সে মাফ করছে না এবং বলে যে আমি মাফ করবো না। তখন আল্লাহ্ পাক বলে থাকেন, "আমিও সেদিন তাকে মাফ করবো না। তুমি যখন আমার বান্দাকে মাফ করছো না, আমিই বা তোমাকে কিভাবে মাফ করতে পারি।

এটা খুবই মারাত্মক ব্যাপার। কাজেই যদি কেউ কারো নিকট অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে সে তার দায়িত্ব পালন করে ফেললো এবং দায়িত্ব মুক্ত হলো, চাই যার নিকট ক্ষমা চাওয়া হলো সে মাফ করুক বা না করুক। কারো হক্ব নষ্ট করে থাকলে, তার নিকট মাফ চেয়ে সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা চাওয়া

আমার ও আপনার কি মূল্য আছে? স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) সম্বোধন করে বললেন, "আজ আমি আমাকে তোমাদের নিকট সমর্পন করছি, যদি কোন ব্যক্তি আমার দ্বারা কষ্ট পেয়ে থাকো, অথবা আমি কারো শারীরিক বা আর্থিক ক্ষতি করে থাকি, তাহলে আমি এখন তোমাদের সামনে দাড়িয়ে আছি, যদি কেউ প্রতিশোধ নিতে চাও, তাহলে প্রতিশোধ নিয়ে নাও। আর যদি মাফ করতে চাও, তাহলে মাফ করে দাও। যাতে করে কিয়ামতের কঠিন দিনে আমার উপর তোমাদের কোন হক্ব বাকী না থাকে।

এবার বলুন! সমগ্র জগতের রহমত, মানব জাতির আদর্শ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যার একটি মাত্র ইশারায় সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন, স্বয়ং তিনি বলছেন যে, যদি আমি কারো প্রতি অন্যায় করে থাকি, কারো হক্ব নষ্ট করে থাকি, তাহলে সে যেন আমার নিকট হতে প্রতিশোধ নিয়ে নেয়। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে এক সাহাবী

দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি একবার আমার কোমরে আঘাত করেছিলেন, আমি তার বদলা নিতে চাই! একথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনরূপ বিরক্ত না হয়ে বললেন, এসো! বদলা নিয়ে নাও, কোমরে আঘাত করো! ঐ সাহাবী যখন কোমরের বরাবর এসে গেল তখন বললো, যখন আপনি আমার কোমরে আঘাত করেছিলেন, তখন আমার কোমর খোলা ছিলো, আর এখন আপনার কোমর ঢাকা, এ অবস্থায়ই যদি আমি বদলা নেই তাহলে তা পূর্ণ বদলা হবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন চাদর জড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন, আমি চাদর তুলে ধরছি। সুতরাং যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর সরিয়ে নিলেন, তখন উক্ত সাহাবী আগে বেড়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পীঠস্থ মোহরে নবুওয়াতকে চুম্বন করলো। অতঃপর সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি এ গোস্তাখি শুধুমাত্র মোহরে নবুওয়াত চুম্বনের নিয়তে করেছি, মেহেরবানী করে আমাকে মাফ করে দিন! (মাজমাউজ্ জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড ২৭ পৃঃ)

মোটকথা এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) নিকট পেশ করেছেন। এখন ভেবে দেখুন, আমার আপনার স্থান কোথায়? যদি আমরাও আমাদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের নিকট এ মর্মে চিঠি লিখি, তাহলে এতে আমাদের কি ক্ষতিটা হবে। আল্লাহ্ যদি মেহেরবানী করে এ অছিলায় মাফ করে দেন। আর সুন্নাতের অনুসরণের নিয়তে যখন আমরা একাজ করবো, তখন এ নিয়তের বরকতে আল্লাহ্ পাক হয়তো বা আমাদের বৈতরণী পার করে দিবেন। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে এর উপর আমল করার তৌফিক দিন। আমীন।

ইসলামের একটি মূলনীতি

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের একটি উসূল বা মূলনীতি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ঈমানের দাবী হলো, নিজের জন্য

ঐ জিনিষই পছন্দ করবে যা অপরের জন্য পছন্দ করো। আর অপরের জন্য ঐ জিনিষই পছন্দ করো, যা নিজের জন্য পছন্দ করে থাকো। আর যা নিজের জন্য অপছন্দ করো, তা অন্যের জন্যও অপছন্দ করো। এখন বলুন! কেউ যদি আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার দোষ নিয়ে আলোচনা করে, তাহলে আপনার অন্তরে ব্যথা লাগবে কিনা? আপনি তাকে ভাল বলবেন না খারাপ বলবেন? যদি আপনি তাকে খারাপ মনে করেন এবং এরূপ দোষ চর্চাকে অপছন্দ করেন, তাহলে অন্যের জন্য তা কিভাবে পছন্দ করতে পারেন? এই দ্বৈতনীতি বানিয়ে নেয়া যে, নিজের জন্য এক নিয়ম, অন্যের জন্য আরেক নিয়ম, এর নামই মুনাফেকী। অর্থাৎ গীবতের মধ্যে মুনাফেকী ও শামিল আছে। যখন উপরোক্ত কথাগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবেন এবং এ পাপের ফলে যে শাস্তি ভোগ করতে হবে তার কথা চিন্তা করবেন, তখন ইনশাআল্লাহ্ গীবত করার উৎসাহ কমে যাবে।

গীবত থেকে বাঁচার সহজ উপায়

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেছেন, গীবত থেকে বাঁচার সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো অন্যের আলোচনাই করবে না। চাই সে আলোচনা ভাল হোক বা মন্দ হোক। কেননা শয়তান বড়ই ধূর্ত, যখন কোন লোকের আলোচনা তার প্রশংসা দিয়ে শুরু করবে যে, তার এই গুণ আছে, এই অভ্যাসটি তার উত্তম, সে বড় ভাল মানুষ, তখন তোমার কল্পনায় একথা থাকবে যে, আমিতো তার প্রশংসাই করছি। কিন্তু শয়তান কোন ফাঁকে যে তার প্রশংসার মাঝে এমন একটি বাক্য জুড়ে দিবে যা পূর্ণ প্রশংসাকে গীবতে পরিণত করবে। যেমন হয়তো বলা হবে যে, অমুক ব্যক্তিতো খুবই ভাল, কিন্তু তার মধ্যে অমুক দোষ আছে। এ "কিন্তু" শব্দই সবকিছু নষ্ট করে দিবে, যার ফলে আলোচনা গীবতের দিকে মোড় নিবে। আর এজন্যে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন, পারতপক্ষে অন্যের আলোচনা করবেই না, চাই সে আলোচনা ভাল হোক বা মন্দ হোক। অন্যের আলোচনা করার প্রয়োজনই বা কি?

হ্যাঁ যদি একান্তই কারো ভাল আলোচনা করতে হয়, তাহলে মজবুতভাবে কোমর বেঁধে-সতর্ক হয়ে বসো, যেন শয়তান ভুল পথে পরিচালিত করতে না পারে।

নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখো

ভাই! অন্যের দোষ কেন দেখ! নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখো, নিজের কৃতকর্মের কথা স্মরণ করো, কেননা অন্যের মধ্যে যদি কোন দোষ থেকে থাকে তাহলে তার জন্য তোমার কোনরূপ শাস্তি হবে না। তার দোষের শাস্তি সে ভোগ করবে। তুমি তোমারই আমলের বদলা পাবে এর ফিকির করা চাই। নিজ আমলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই। অন্যের দোষের খেয়াল মানুষের তখনই আসে যখন সে নিজ অন্যায় সম্পর্কে বে-খবর থাকে। কিন্তু যখন নিজ দোষের চিত্র সামনে থাকে, তখন অন্যের দোষের দিকে ভুলেও চোখ যায় না এবং যবানে এ আলোচনা আসে না। আল্লাহ্ পাক আপন ফযলে আমাদেরকে আমাদের দোষ-ত্রুটি ও অন্যায়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার তৌফিক দান করুন। আমীন।

আমাদের সমাজের সকল ফ্যাসাদ এজন্য তৈরি হয় যে, আমরা আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখি না। আমরা একথাও ভুলে গেছি যে, আমার কবরে গিয়ে আমাকেই থাকতে হবে। আমরা একথাও ভুলে বসেছি যে, আমাকে আল্লাহ্ পাকের দরবারে জওয়াদেহী করতে হবে। "আমরা এ সকল কথা বে-মা'লুম ভুলে গিয়ে, কখনও এর গীবত করছি, কখনও ওর গীবত করছি যে, অমুকের এ দোষ আছে, অমুকের মধ্যে এ ভুল আছে। মোটকথা আমরা দিন-রাত এ জঘন্য পাপে লিপ্ত আছি। আল্লাহ্র ওয়াস্তে এ পাপ থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করুন।

আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দাও

আমরা যে অবস্থায় যে সমাজে বাস করছি, এ সমাজে গীবত থেকে বেঁচে থাকা কষ্টকর বটে, কিন্তু এ থেকে বেঁচে থাকা মানুষের

ক্ষমতার বাইরে নয়। কেননা যদি গীবত থেকে বেঁচে থাকা মানুষের সাধ্যাতীত হতো, তাহলে আল্লাহ্ পাক গীবতকে হারাম করতেন না। এ থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, গীবত থেকে বেঁচে থাকার শক্তি মানুষের আছে। কাজেই যখন আলোচনার বিষয়-বস্তু গীবতের দিকে মোড় নেয়, সাথে সাথে আগের গীবত বর্হিভূত বিষয়ে ফিরে আসবে, আর যদি কোন সময় গীবত হয়েই যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ তৌবা ও ইস্তিগফার করে নিবে এবং ভবিষ্যতে কখনো গীবত না করার শপথ করে নিবে।

গীবত সকল অনিষ্টের মূল

মনে রাখা দরকার যে গীবতই সকল ফাসাদের মূল। ঝগড়া এই গীবতের কারণেই হয়, পরস্পরে অনৈক্যও এর কারণেই হয়ে থাকে। বর্তমানে আমাদের সমাজে যে বিশৃঙ্খলা দৃষ্টি গোচর হয়, এজন্য গীবতও অনেকাংশে দায়ী। যদি কেউ (খোদা না করুন) মদ পান করে, তাহলে দ্বীনের সাথে যার সামান্য সম্পর্কও আছে সে ঐ মদ পানকারীকে খারাপ নজরে দেখবে, তাকে খারাপ মনে করবে এবং মনে মনে বলবে এ ব্যক্তি অত্যন্ত গর্হিত কাজে লিপ্ত আছে। আর যে এ কাজ করছে সেও ভাববে, আমি বড় অন্যায় ও ভুল করছি, আমি মারাত্মক পাপে লিপ্ত আছি। কিন্তু কেউ যদি গীবত করতে থাকে, তাহলে তার সম্পর্কে এরূপ খারাপ অনুভূতি অন্তরে সৃষ্টি হয় না। আর যে ব্যক্তি স্বয়ং গীবত করছে সেও একথা মনে করে না যে, আমি কোন মারাত্মক গোনাহ্র কাজে লিপ্ত আছি। এর অর্থ হলো, এই গোনাহের কদর্যতা, জঘন্যতা ও মারাত্মক পরিণতির কথা আমাদের অন্তরে এখনো পাকা-পোক্ত হয়ে বসেনি এবং এর হাকীকত সম্পর্কেও আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় নয়। কারণ হলো মদ পান করার গোনাহ্ এবং গীবতের গোনাহের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোন পার্থক্য নেই। যদি মদ পান করাকে অপরাধ এবং খারাপ মনে করা হয়, তাহলে গীবত

করাকেও অপরাধ এবং খারাপ মনে করতে হবে এবং গীবতের কদর্যতা, জঘন্যতা ও মারাত্মক পরিণতির ভয় অন্তরে পয়দা করতে হবে।

ইশারার মাধ্যমে গীবত করা

একবার উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রাঃ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসে আলোচনা করছিলেন। কথায় কথায় উম্মুল মুমিনিন হযরত সুফিয়ার (রাঃ) কথা উঠলো, যেহেতু সতীনদের পরস্পরের সামান্য বিদ্বেষ হয়েই থাকে, আর হযরত আয়েশা (রাঃ) ও মানবিক দুর্বলতা মুক্ত নন। কাজেই তিনি হযরত সুফিয়ার (রাঃ) কথা বলতে গিয়ে হাত দিয়ে এভাবে ইশারা করলেন যার অর্থ হলো, তিনি বেঁটে। হযরত আয়েশা (রাঃ) মুখে বলেননি যে, তিনি বেঁটে, বরং শুধু হাত দিয়ে ইশারা করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, "হে আয়েশা! আজ তুমি এমন একটি কাজ করেছো, যদি এ কাজের দুর্গন্ধ এবং বিষ কোন সাগরে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে তা সমগ্র সমুদ্রকে দুর্গন্ধময় এবং বিষাক্ত করে দিবে।" এখন আপনারাই চিন্তা করে দেখুন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবতের সামান্য ইশারার কিরূপ কদর্যতা ও জঘন্যতা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি আমাকে সারা দুনিয়ার ধন সম্পদ দিয়ে দেয় এবং এর বিনিময়ে কারো প্রতি বিদ্রুপ করে তার নকল করতে বলে, যার মধ্যে তাকে বিদ্রুপ করা এবং তার বদনামের দিকও থাকে তথাপিও আমি একাজ করতে প্রস্তুত নই। (তিরমিজী শরীফ হাদীস নম্বর ২৬২৪)

গীবতের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন

বর্তমানে কাউকে বিদ্রুপ করে তার নকল করাটা বিনোদনের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে, আর যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে বেশি পারদর্শী, মানুষেরা তার প্রশংসা করে, তাকে ধন্যবাদ জানায়। অথচ এ ব্যাপারে

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, কেউ যদি আমাকে সারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ দিয়ে দেয়, তাহলেও আমি কারো নকল করতে প্রস্তুত নই। এ থেকে বুঝা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত গুরুত্বের সাথে এ থেকে বাধা দিয়েছেন। জানিনা আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা মদ পান করা, ব্যভিচার করাকে তো ঘৃণা করি এবং খারাপ মনে করি, কিন্তু গীবতকে ঘৃণাও করি না খারাপও মনে করি না। বরং গীবতকে মাতৃস্তনের মতই প্রিয় মনে করি। আমাদের কোন বৈঠকই গীবত শূন্য হয় না। অথচ গীবত মদ পান ও ব্যভিচারের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আল্লাহ্র ওয়াস্তে এ মারাত্মক পাপ পরিহার করুন।

গীবত থেকে বাঁচার উপায়

গীবত থেকে বাঁচার উপায় হলো, এর কদর্যতা এবং মারাত্মক শাস্তি ও পরিণতির কথা মনের মধ্যে বসিয়ে নিয়ে এই পণ করবে যে, জীবনে কখনও কারো গীবত করবো না। অতঃপর বিনয়ের সাথে আল্লাহ্ পাকের দরবারে এ দু'আ করবে, হে আল্লাহ্! গীবতের এ মারাত্মক পাপ থেকে আমি বিরত থাকতে চাই। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলতে গিয়ে গীবত করে ফেলি, হে আল্লাহ্! আমি এ শপথ করছি যে, ভবিষ্যতে কখনও গীবত করবো না; কিন্তু আমার এই শপথকে ঠিক রাখা এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা তোমার সাহায্য ও তৌফিক ব্যতীত সম্ভব নয়। হে আল্লাহ্! তুমি নিজ অনুগ্রহে আমাকে গীবত থেকে বেঁচে থাকার সাহস, উৎসাহ ও তৌফিক দান করো। আজই হিম্মত করে এ শপথ ও দু'আ করুন।

গীবত থেকে বেঁচে থাকার পণ করুন।

মানুষ যে কোন কাজ করার ইচ্ছা করুক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাজের জন্য দৃঢ়পণ করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজই হয় না। কেননা সর্বপ্রকার নেক কাজেই শয়তান বাধা দিয়ে থাকে এবং সে

কাজকে পিছে ঠেলতে থাকে। সাথে সাথে এ পরামর্শ দেয় যে, ঠিক আছে এ কাজ আগামী দিন থেকে শুরু করা যাবে, পরের দিন দেখা যায় যে, কোন ওজর পেশ আসার ফলে আর কাজ করা সম্ভব হয় না, তখন মনে মনে বলে ঠিক আছে আগামী দিন থেকেই আরম্ভ করবো, পরে দেখা যায় আগামী দিন শুধু আগামীই থেকে যায়, বর্তমান আর হয় না। কাজেই যে কাজ করার আছে তা এখনই করতে হবে।

দুনিয়ার কাজেও আমরা দেখি, যার উপার্জন নেই অথচ খরচ আছে, সে রোজগারের জন্য কিরূপ পাগলপারা হয়ে মেহনত করতে থাকে। যদি কেউ ঋণী হয়, তাহলে সে তা পরিশোধ করার জন্য কিরূপ প্রচেষ্টা চালায়। যদি কেউ অসুস্থ থাকে তাহলে সে আরোগ্য লাভের জন্য ব্যাকুল থাকে। অথচ আমাদের কি হলো? আমরা আমাদের বদ-অভ্যাস ত্যাগ করতে না পেরেও চিন্তিত হইনা। নিজ অন্তরে অনুশোচনা সৃষ্টি করে, ব্যাকুল ও অনুতপ্ত হয়ে দু'রাকাত সালাতুল -হাজাত পড়ে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে অনুনয়-বিনয় করে দু'আ করুন, "হে আল্লাহ! আমি এ মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে চাই, তুমি অনুগ্রহপূর্বক স্বীয় রহমত দ্বারা আমাকে এ থেকে বাঁচিয়ে রেখ। আমাকে দৃঢ়তা দান করো। এ দু'আর পর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবে এবং নিজেকে এ প্রতিজ্ঞা পালনে বাধ্য রাখবে।

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন যদি এতে কাজ না হয়, তাহলে নিজের উপর কিছু জরিমানা নির্দিষ্ট করে নাও। যেমন এই প্রতিজ্ঞা করবে যে, যদি কোন সময় গীবত হয়ে যায়, তাহলে দু'রাকাত নফল নামায পড়বে, কিংবা এত টাকা আল্লাহ্র রাস্তায় দান করবে, এভাবে আ'মল করলে ধীরে ধীরে ইন্শাআল্লাহ এ পাপ থেকে নাজাত পাওয়া যাবে। এ বদ-অভ্যাস থেকে তো অবশ্যই নাজাত পেতে হবে, এর জন্য ঐরূপ ব্যাকুলতাও সৃষ্টি করতে হবে, যেরূপ ব্যাকুলতা কোন মারাত্মক রোগের রোগী চিকিৎসার জন্য প্রকাশ করে থাকে। কেননা এ বদ-অভ্যাসও একটি মারাত্মক অসুখ। আর এটা শারীরিক অসুখের চেয়েও মারাত্মক। কেননা এটাও মানুষকে দোযখের দিকে নিয়ে যায়।

কাজেই এ পাপ থেকে নিজেও বাঁচুন এবং নিজ পরিবারকেও বাঁচান। আর এ জঘন্য পাপ মহিলাদের মাঝে বেশি দেখা যায়। যেখানে দু'চারজন মহিলা একত্রিত হয়, সেখানে কারো না কারো সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়ে যায়, সাথে সাথে গীবতও আরম্ভ হয়ে যায়। যদি মহিলাগণ এ গোনাহ্ থেকে বাঁচার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, তাহলে সহজেই পুরা পরিবার এ পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং পূর্ণ সংসারের সংশোধন হতে পারে। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে এর উপর আমল করার তৌফিক দিন। আমীন।

চোগলখোরী একটি মারাত্মক গোনাহ্

অপর একটি গোনাহ্ হলো "চোগলখোরী" যা গীবতের চেয়েও মারাত্মক। আরবীতে একে نَمِيْمَة বলা হয়; আর উর্দু এবং বাংলায় এর অনুবাদ করা হয় "চোগলখোরী" শব্দ দিয়ে। এর প্রকৃত অর্থ হলো, কারো কোন দোষ অন্য কারো সামনে এ নিয়তে বর্ণনা করা যেন শ্রোতা ঐ ব্যক্তির ক্ষতি করে। সাথে সাথে ঐ ব্যক্তির ক্ষতির কারণে এ বর্ণনাকারী মনে মনে খুশি হয় যে, বেশ হয়েছে তার কষ্ট হয়েছে। যে দোষ বর্ণনা করা হয়েছে, চাই তা ঐ ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যাক বা না যাক, তার মধ্যে সে দোষ থাক বা না থাক। তুমি শুধু এই নিয়তে বর্ণনা করেছো যে, শ্রোতা যেন তাকে কষ্ট দেয়, একেই نميمة বলে।

চোগলখোরী গীবতের চেয়ে মারাত্মক

পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে চোগলখোরীর অনেক নিকৃষ্টতা বর্ণিত হয়েছে। এটা গীবতের চেয়েও জঘন্য। কেননা গীবতের মধ্যে নিয়ত খারাপ থাকে না যে, যার দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে তার কোন প্রকার কষ্ট বা ক্ষতি হোক। পক্ষান্তরে "চোগলখোরী"র মধ্যে এই খারাপ নিয়ত থাকে যে, যার বদনাম করা হচ্ছে, তার কোন ক্ষতিও যেন হয়। কাজেই এটা দু'টি গোনাহ্‌র সমষ্টি। একটি হলো গীবত,

আরেকটি হলো এক মুসলমান ভাইকে কষ্ট দেয়ার নিয়ত। এ জন্য কুরআন ও হাদীসে এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী এসেছে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

(এখানে কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে) এ ব্যক্তি ঐ লোকের মত চলে যে, অন্যকে তিরস্কার করে-খোঁটা দেয় এবং একজনের কথা অন্যজনের নিকট লাগায়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

অর্থাৎ 'চোগলখোর' বেহেশ্তে যাবে না। (বোখারী শরীফ আদব অধ্যায়)

কবরের আযাবের দু'টি কারণ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদেরকে (রাযিঃ) সাথে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তার পাশে এক জায়গায় দু'টি কবর দেখলেন, যখন তিনি ঐ কবরদ্বয়ের নিকেট পৌঁছলেন, তখন তার দিকে ইশারা করে সাহাবায়ে কিরামকে (রাযিঃ) বললেন, "এই দুই কবরের বাসিন্দাদের উপর আযাব হচ্ছে।" [আল্লাহ্ পাক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। এক হাদীসে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন কবরের মধ্যে আযাব হয়, তখন আল্লাহ্ পাক মেহেরবাণী করে ঐ আযাবের আওয়াজ আমাদের থেকে গোপন রাখেন। কেননা যদি ঐ আযাবের আওয়াজ মানুষ শুনতে পেত তাহলে কেউ জীবিত থাকতে পারতো না। কোন কাজও করতে পারতো না। দুনিয়া অচল হয়ে যেত। এজন্যই আল্লাহ্ পাক এ আওয়াজকে গোপন রেখেছেন। অবশ্য কোন কোন সময় মানুষের শিক্ষার জন্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে।] অতঃপর মহানবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা জানো কি? এ আযাব কেন হচ্ছে? তারপর নিজেই উত্তর দিলেন, এদের দু'কারণে আযাব হচ্ছে, এদের একজন পেশাবের ছিঁটা থেকে নিজের কাপড় এবং শরীরকে বাঁচাতো না। সে সময় মানুষ উট এবং ছাগল চড়াতে অভ্যস্ত ছিলো, যার দরুন সব সময় ঐ সকল পশুর সাথে কাটাতে হতো এবং তার পেশাবের ছিঁটাও গায়ে বা কাপড়ে এসে যেতো। তা থেকে বাঁচার চেষ্টা এবং সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে আযাব হচ্ছে। অথচ ইচ্ছে করলে এবং সতর্ক হলে এ থেকে বাঁচা কোন কঠিন কাজ নয়। অথবা সে হয়তো এমন কোন জায়গায় পেশাব করতে বসেছে যেখানে পেশাবের ছিঁটা কাপড়ে বা গায়ে এসে পড়ে। এখানেও সে ইচ্ছে করলে নরম জায়গায় বসতে পারতো। (মসনাদে আহমাদ, ৫ঃ৪৯)

পেশাবের ছিঁটা থেকে বাঁচা

আলহামদুলিল্লাহ! ইসলামে পবিত্রতার আদব বিস্তারিতভাবে শিক্ষা দেয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা তো মোটামুটিভাবে শিখানো হয়, কিন্তু শরয়ী পবিত্রতার আহকাম কিছুই শিখানো হয়না। পেশাবখানা-পায়খানা এমনভাবে তৈরি করা হয় যে, ইচ্ছে করেও পেশাবের ছিঁটা থেকে বাঁচা মুশ্‌কিল হয়ে যায়। অথচ এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اِستنزهوا عن البول فانّ عامة عذابِ القبر منه

অর্থাৎ ঃ পেশাব থেকে বাঁচো, কেননা অধিকাংশ কবরের আযাব পেশাবের কারণে হয়ে থাকে। পেশাবের ছিঁটা শরীরে বা কাপড়ে লেগে যাওয়ার কারণে কবরের আযাব হয়, এজন্য এ থেকে খুবই সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

'চোগলখোরী' থেকে বেঁচে থাকা

হাদীসে বর্ণিত অপর ব্যক্তির আযাব এজন্য হচ্ছিলো যে, সে অন্যের 'চোগলখোরী' করে বেড়াতো। এ থেকে জানা গেল যে, 'চোগলখোরী'র কারণে আযাব হয়ে থাকে। আর 'চোগলখোরী' গীবতের চেয়েও জঘন্য। কারণ এতে খারাপ উদ্দেশ্যে একজনের দোষ অন্যের নিকট বর্ণনা করা হয়ে থাকে, যেন সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কষ্ট পায়।

গোপন কথা প্রকাশ করা

ইমাম গায্যালী (রহঃ) ইয়াহ্ইয়াউল উলূম গ্রন্থে লিখেছেন যে, কারো কোন গোপন কথা বা তথ্য প্রকাশ করে দেয়াটাও 'চোগলখোরী'র অন্তর্ভূক্ত। যেমন কোন লোকের এমন কিছু কথা বা বিষয় আছে যা, সে চায় না যে, তা অন্যের নিকট প্রকাশ হয়ে যাক। চাই তা ভাল হোক বা খারাপ। যেমন কোন ধনী ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ অন্য লোকদের নিকট হতে গোপন রাখতে চায়, সে এটা পছন্দ করে না যে, তার সম্পদের পরিমাণ লোকেরা জানুক। এখন আপনি কোনভাবে তা জেনে নিয়ে সকলের নিকট গেয়ে বেড়াচ্ছেন যে, ঐ ব্যক্তির নিকট এত এত সম্পদ আছে। তার এ গোপন বিষয়কে আপনি যে প্রকাশ করলেন, এটা 'চোগলখোরী' বলে গণ্য হবে। আর তা নিতান্তই হারাম। অথবা কেউ তার পারিবারিক ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছে, আপনি যে কোন উপায়ে জানতে পেরে অন্যের নিকট তা বলতে শুরু করলেন। এও 'চোগলখোরী' এমনিভাবে কারো কোন গোপন তথ্য তার অনুমতি ব্যতীত অন্যের নিকট প্রকাশ করা 'চোগলখোরী'র অন্তর্ভূক্ত। এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

المجالس بالامانة۔

অর্থাৎ ঃ 'মজলিসের মধ্যে যে সকল কথা বলা হয় তাও আমানত।' যেমন কেউ আপনাকে বিশ্বস্ত মনে করে মজলিসের মধ্যে

কোন কথা আপনাকে বললো, একথা আপনার নিকট তার আমানত। এখন যদি আপনি এ কথা অন্যের নিকট বলে দেন, তাহলে তা আমানতের খিয়ানত হবে এবং এটাও 'চোগলখোরী'র অন্তর্ভূক্ত হবে।

যবানের দু'টি মারাত্মক গোনাহ্

মোটকথা আমরা এ নিবন্ধে যবান তথা মুখের গোনাহ্সমূহ হতে দুটি মারাত্মক গোনাহ্র আলোচনা করলাম। এ সকল গোনাহ্র ভয়াবহতা আপনারা হাদীসের আলোকে জানতে পেরেছেন। এ সকল যত বেশি মারাত্মক ও জঘন্য, আমরা তা থেকে তত বেশি গাফেল। আমাদের মজলিস আমাদের ঘর এ সকল পাপে পূর্ণ। আমাদের যবান লাগামহীনভাবে কাঁচির মত কেটে চলছে, যামার কোন নাম নেই। আল্লাহ্র ওয়াস্তে যবানে লাগাম দিন। একে নিয়ন্ত্রণ করুন। যবানকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুম অনুযায়ী চালনা করুন। অন্যথায় এর কারণে পরিবারের পর পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরস্পরে মতবিরোধ, ফিতনা ও শত্রুতা বেড়ে যাচ্ছে, এর কারণে আপন পর সকলেই একে অন্যের শত্রু হয়ে যাচ্ছে। আখিরাতে এর ফলে যে ভয়াবহ পরিণতি হবে তাতো আছেই। কিন্তু দুনিয়াতেও আল্লাহ্ পাকই জানেন এর কারণে কত ফিতনার সৃষ্টি হচ্ছে।

আল্লাহ্ পাক আপন ফযল ও রহমতে এ জঘন্য পাপের কদর্যতা, ভয়াবহতা আমাদেরকে উপলব্ধি করার ও এ থেকে বেঁচে থাকার উপায়সমূহের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

ইসলাহুল গীবত

গীবতের ক্ষতি ও তার চিকিৎসা

মূল

মুহিউস্ সুন্নাহ আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক সাহেব। (দামাত বারাকাতুহুম)

ইসলাহুল গীবত

আজকাল গীবতের প্রচলন খুব বেশি। অথচ গীবত এমন একটি বদ-অভ্যাস যার দ্বারা দ্বীন-দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই অপদস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। এ কারণে কতিপয় দোস্তের ইচ্ছে অনুযায়ী সংক্ষিপ্তাকারে গীবতের কিছু ক্ষতি ও গীবত থেকে বাঁচার উপায় বুযুর্গদের কিতাব ও ওয়াজ থেকে উপস্থাপন করা হলো। এ সকল কথা বার বার চিন্তা করলে এবং এর উপর আমল করলে ইন্‌শা আল্লাহ্ এ মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

গীবতের ক্ষতি

(১) গীবতের কারণে মানুষের মাঝে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। আর এ থেকে মামলাবাজী, লড়াই, ঝগড়া সবকিছুই হতে পারে। এছাড়া ঐক্যের মধ্যে যে কল্যাণ ও লাভ রয়েছে অনৈক্যের কারণে তা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। (২) গীবত করার সাথে সাথেই অন্তরে এমন একটি অন্ধকারের সৃষ্টি হয় যার কারণে খুবই কষ্ট ভোগ করতে হয়, যেন কেউ গলায় চাপ দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করছে। যার অন্তরে সামান্য অনুভূতিও আছে সে তা অনুভব করে থাকে। (৩) গীবতের দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার এ ক্ষতি হয় যে, যার গীবত করা হয়েছে যদি সে জানতে পারে তাহলে যে ব্যক্তি গীবত করেছে তাকে মারাত্মকভাবে হেনস্তা করে ছাড়বে। বরং যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে তার খবর ভালভাবেই নিয়ে ছাড়বে। আর দ্বীনের ক্ষতি হলো, আল্লাহ্ পাক ঐ ব্যক্তির প্রতি নারাজ হন, আর আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টিই দোযখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ হয়। (৪) হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, গীবত যিনা-ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক ও ক্ষতিকারক। (৫) যে ব্যক্তি অন্যের গীবত করে আল্লাহ্ পাক তাকে মাফ করবেন না, যতক্ষণ না ঐ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাফ

করেন। কেননা গীবত হুকূকুল ইবাদ-বান্দার হক্কের অন্তর্ভুক্ত। (৬) গীবত করা যেন আপন মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া। এমন জঘন্য কে আছে? যে আপন মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাবে। যেরূপভাবে এ কাজকে ঘৃণ্য মনে করা হয়, তদ্রুপ গীবতের বেলায়ও হওয়া উচিত। (৭) গীবতকারী ভীতু, কাপুরুষ ও দুর্বল চিত্ত হয়ে থাকে, আর এ দুর্বলতার কারণেই অন্যের অনুপস্থিতিতে তার দোষ চর্চা বা গীবত করে। (৮) গীবত করার কারণে চেহারার নূর-ঔজ্জল্য ম্লান হয়ে যায়। এরূপ ব্যক্তিকে সকলেই অপমানের চোখে দেখে থাকে। (৯) গীবতের অন্যতম ক্ষতি হলো গীবতকারীর নেকীসমূহ যার গীবত করেছে তাকে দিয়ে দেয়া হবে, এতেও যদি ক্ষতিপূরণ না হয়, তাহলে যার গীবত করা হয়েছে তার পাপসমূহ গীবতকারীর ঘাড়ে চাপানো হবে। যার ফলে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। আর হাদীস শরীফে এরূপ ব্যক্তিকে "ধর্মীয় দেউলিয়া" বা দ্বীনের নিঃস্ব (মিসকীন) বলা হয়েছে। কাজেই দুনিয়ায় থাকাকালীনই যে কোন উপায়ে গীবতজনিত ত্রুটি মাফ করিয়ে নে'য়া চাই।

গীবতের চিকিৎসা

(১) গীবতের আ'মলী চিকিৎসা ও করা চাই। আর তাহলো যখন কেউ কারো গীবত করে, তখন যদি শক্তি ও সামর্থ্য থাকে তাহলে তাকে গীবত করতে বারণ করবে এবং বাধা দিবে। আর যদি তাকে বাধা দে'য়ার শক্তি না থাকে তাহলে নিজে ঐ জায়গা থেকে অবশ্যই উঠে চলে যাবে, এতে ঐ ব্যক্তির মনক্ষুন্ন হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করবে না। অন্যের মনভাঙ্গার প্রতিলক্ষ্য করে নিজের দ্বীন ভাঙ্গা অর্থাৎ দ্বীনদারীর ক্ষতি করা যাবে না। কাজেই এ থেকে বেঁচে থাকা অনেক বেশি জরুরী। এমনিভাবে যদি উঠতে না পারা যায় তাহলে কোন বাহানা করে উঠে যাবে, অথবা ইচ্ছা পূর্বক কোন ভাল আলোচনা শুরু করে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিবে। (২) গীবতের অন্য একটি অদ্ভুত ও

আজব আমলী চিকিৎসা হলো, যার গীবত করা হয়েছে তাকে নিজের জঘন্য পাপের কথা জানানো। ইন্‌শা আল্লাহ নিয়মিতভাবে অল্প কিছু দিন এর উপর আ'মল করলে এ মারাত্মক রোগ সমূলে বিনাশ হয়ে যাবে। (৩) পরিপূর্ণভাবে লাভবান হওয়ার জন্য উপরোক্ত কাজগুলোর সাথে সাথে কোন খাঁটি দ্বীনদার আল্লাহ্‌ওয়ালা বুযুর্গের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করাও একান্ত জরুরী। যাতে করে উপরোক্ত আমলসমূহের প্রভাব (আছর) প্রকাশ না হওয়া, কিংবা লাভবান না হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ বুযুর্গের সাথে যোগাযোগ করে এর চিকিৎসা করানো যায়।

যে সকল ক্ষেত্রে গীবত করা জায়িয

কোন কোন ক্ষেত্রে গীবত করা জায়িয আছে। যেমন যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির দোষ গোপন রাখলে দ্বীনের অথবা অন্য কোন মুসলমানের ক্ষতির প্রবল আশংকা হয়। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট তার অবস্থা (দোষ) বর্ণনা করে দিবে। এ কাজ নিষিদ্ধ নয়। কারণ তা কল্যাণ কামনা, পরোপকারিতা ও নছিহতের অন্তর্ভূক্ত। অবশ্য কারো গীবতের পূর্বে তার অবস্থা লিখে কোন আমলদার আলিম থেকে ফতোয়া নিয়ে নিবে, অতঃপর তাঁর ফতোয়া অনুযায়ী আমল করবে। যদি গীবতের ক্ষেত্রে দ্বীনের কোন প্রয়োজন না থাকে, শুধুমাত্র প্রবৃত্তির চাহিদায় কারো প্রকৃত অবস্থা (দোষ) বর্ণনা করাও হারাম ও গীবতের অন্তর্ভূক্ত। আর ভালমত না জেনে কারো কোন দোষ বর্ণনা করা তো অপবাদের শামিল, যা আরো জঘন্য, আরো বেশি মারাত্মক।

জেনে রেখ!

যদি পীর সাহেবের দরবারেও কারো গীবত আরম্ভ হয়ে যায়, তাহলেও সাথে সাথে উঠে চলে যাবে। কেননা বৃষ্টি যেমন অতি উত্তম জিনিষ, তার মধ্যে গোসল করাও ভাল, উপকারীও বটে। কিন্তু যখন শিলা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন পলায়ন করাই ভাল।

গীবত কাকে বলে

গীবত বলা হয় কোন মুসলমানের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা আলোচনা করা যে, যদি সে তা শুনে তাহলে তার নিকট তা কষ্টকর হয়। যেমন কাউকে বে-অকুফ (নির্বোধ) অথবা বোকা বলা, অথবা কারো বংশের বা গোত্রের দোষ বের করা, অথবা কারো কোন কাজ, অভ্যাস, বাড়ি-ঘর, পশু-পাখি বা লেবাস-পোশাক মোটকথা যে জিনিষের সাথেই সে সংশ্লিষ্ট আছে, তার এমন কোন দোষ বর্ণনা করা, যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়। চাই সে দোষ যবানে বা কোন সংকেতে প্রকাশ করুক বা হাত বা চোখের ইশারায় অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নকল ও অভিনয় করেই হোক না কেন–এগুলো সবই গীবতের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন।